দেশ ও মানুষ ৫

বিমলেন্দু ভট্টাচার্য • অনিমা ভট্টাচার্য

ভূগোল

দশম শ্রেণী



পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ অনুমোদিত দশম শ্রেণীর
পাঠক্রম অনুসারে লিখিত

দেশ ও মানুষ ৫

বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, এম্. এ (কলিকাতা)
বিভাগীয় প্রধান, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা, আই. আই. টি.,
খড়গপুর, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

অণিমা ভট্টাচার্য, এম্. এ (কলিকাতা ও লণ্ডন), বি. টি (কলিকাতা)
অধ্যাপিকা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন অধ্যাপিকা, মতিঝিল কলেজ, আশুতোষ কলেজ, হেস্টিংস
ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা

কলিকাতা
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস
দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ
১৯৭৪

DESH O MANUSH 5 (Bengali)

(The Land the People)

by

Bimalendu Bhattacharya

Anima Bhattacharya

ছবি ও মানচিত্র : নির্মল চন্দ। প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

Printed in India by Debdas Nath, Sadhana Press P. Ltd. Calcutta 12 and published by John Brown, Oxford University Press, Faraday House, P-17, Mission Row Extension, Calcutta 700013

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিদ্যালয় জীবনে ভূগোল পাঠের শেষ অধ্যায় এই গ্রন্থ। স্বদেশ পরিচয়ে ছাত্রছাত্রীদের যে ভূগোলপাঠ শুরু--শেষ পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনীতিক পটভূমি বিশ্লেষণে তা তা পূর্ণতা লাভ করবে। এই শেষ ধাপেই তারা এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও ওশিয়ানিয়া ভূখণ্ডের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হবার সুযোগ পেল। সুদূরের এই পরিচিতি তাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে শুধু সমৃদ্ধই করবে না---এখান থেকে বহির্জগতের উন্মুক্ত দ্বার তাদের মনকে বার বার ডাক দেবে অজানার সন্ধানে। অনুসন্ধানের এই চিরন্তন চিত্তবৃত্তি তাদের সুযোগ মত সার্থক ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি দান করবে। যে চিত্তবৃত্তি একদিন কলম্বাস, ড্রেক ও কুক প্রভৃতি মনীষাকে ঘরছাড়া করেছিল হয়ত সেই একই অনুসন্ধিৎসা বৃহত্তর ভূগোল পাঠের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসু মনকে নানাদিকে ছড়িয়ে দেবে। নতুনের ডাক, অজানার হাতছানি চিরদিন তাদের আকৃষ্ট করবে। এই ভূগোল পাঠ তাদের শুধু জ্ঞানদানই করবে না--তাদের মনকে অনির্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত করবে বলে আশা রাখি। বিদেশের আরও চিত্র সংযোজন করতে পারলে বইখানি সমৃদ্ধ হত, কিন্তু সুযোগের অভাবে তা সম্ভব হল না।

বিমলেন্দু ভট্টাচার্য
অণিমা ভট্টাচার্য

প্রথম অধ্যায়

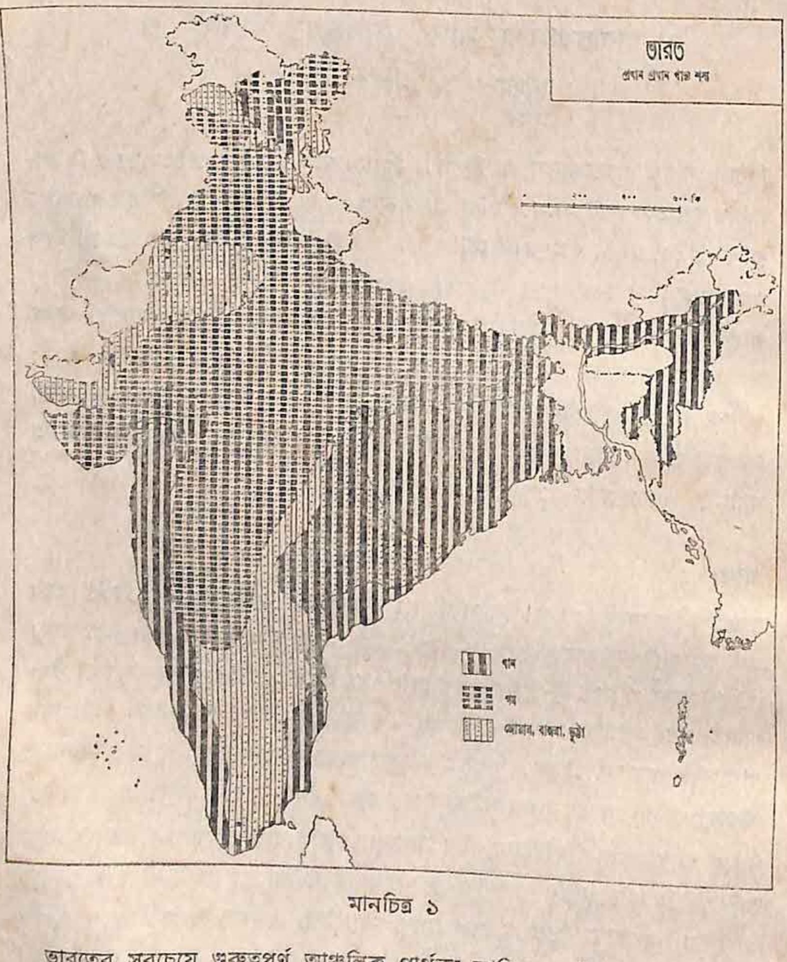
ভারতবাসীর খাদ্য, বেশভূষা, বাসগৃহ ও ভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য

বিশাল দেশ ভারতের জনসংখ্যা বিপুল। ১৯৭১ সালে এদেশের ৩,১৯২,২৩৩ কিলোমিটার আয়তনে মোট জনসংখ্যা ছিল ৫৪৭,৯৪৯,৮০৯। বিপুল সংখ্যক এই জনগণের কৃষ্টিগত বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি ভারতীয় কৃষ্টিকে নানাভাবে বিশিষ্টতা দান করেছে। উত্তরে প্রায় দুর্ভেদ্য পর্বতপ্রাচীর, দক্ষিণে আন্দোলিত মালভূমি, মধ্যভাগে বিস্তৃত সমভূমি ছাড়াও শীতল, উষ্ণ, আর্দ্র ও শুষ্ক জলবায়ু মানুষের খাদ্য, বেশভূষা ও বাসগৃহকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ঐতিহাসিক বিচারে সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতে নানা জাতির আগমন এদেশের খাদ্য, বেশভূষা ও বাসগৃহের সঙ্গে ভাষাকে বিচিত্রতর করে তুলেছে। কবির ভাষায় ভারত যথার্থই 'মহামানবের সাগরতীর'।

খাদ্য

ভারতবাসীর খাদ্য প্রধানত শস্যভিত্তিক। আঞ্চলিক ফলনের ওপর নির্ভর করে এদেশের অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস গড়ে উঠেছে। আর্দ্র অঞ্চলের প্রধান শস্য ধান। নাতিশীতোষ্ণ ও সাভানা-জলবায়ু অঞ্চলের শস্য গম। তেমনি শুষ্ক অঞ্চলের উৎপাদিত শস্য জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা প্রভৃতি (মানচিত্র ১)। এই কারণে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ওড়িশা, দক্ষিণ বিহার, তামিলনাড়ু, কেরালা ও পশ্চিম উপকূলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত। অনুরূপভাবে বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের খাদ্য গম থেকে লব্ধ আটার রুটি বা চাপাটি। জম্মু ও কাশ্মীরের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত, রুটি ও ভুট্টা। এ ছাড়া রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের এক বৃহদংশও রুটিভোজী। অপরপক্ষে মধ্যভারত, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও মহীশূরের শুষ্কাঞ্চলের মানুষের খাদ্য জোয়ার, বাজরা। পার্বত্য অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ জোয়ার, বাজরা, কোদো ও ভুট্টা খেয়ে জীবনধারণ করে। ভাত বা রুটির সঙ্গে সব অঞ্চলেই ডাল দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য। কিন্তু রান্নায় তেলের ব্যবহার অঞ্চলভেদে বিভিন্ন। যেমন ভারতের পূর্বাঞ্চলের রান্নার উপাদান সরষের তেল। সরষের তেল

পশ্চিমেও বহু জায়গায় ব্যবহার হয়। তবে দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে, যেমন মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের নিত্যব্যবহার্য তেল বাদাম তেল। দক্ষিণে বহু রাজ্যের রান্নার উপাদান নারকোল তেল ও বনস্পতি। এছাড়া মধ্যভাগের অপর প্রধান তেল তিসির তেল।



মানচিত্র ১

ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক পার্থক্য আমিষ ও নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস। আমিষাশী ও নিরামিষাশী খাদ্যাভ্যাসের উদ্ভব সম্পর্কে নানা প্রশ্নের অবকাশ দেখা যায়। পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পক্ষীসম্পদ যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ভারতবাসীর এক বিরাট অংশ নিরামিষাশী। ভারতের বাইরে প্রায় সর্বত্র দেখা যায়, মানুষ আমিষভোজী। বহির্বিশ্ব থেকে এদেশের এই স্বাতন্ত্র্য তাই চিন্তাশীলদের মনে সমস্যার

সৃষ্টি করেছে। ব্যাখ্যা হিসেবে ধর্মীয় প্রভাব, কৃষিসমৃদ্ধি ও মহাদেশীয় অবস্থান ইত্যাদি কারণের অবতারণা করা যায়।

হিন্দুধর্মের পীঠস্থান হলেও ভারত বৌদ্ধ ও জৈনধর্মেরও জন্মস্থান। অহিংসাব্রত এই দুই ধর্মের মূলকথা। ঐতিহাসিক কারণে বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা এদেশে বর্তমানে অপ্রধান হলেও জৈনধর্মের প্রভাব যথেষ্ট। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অহিংসাব্রতের শিক্ষা ভারতীয় জীবনে গভীরভাবে নিহিত। অহিংসাব্রতের এই ঐতিহ্যের ফলে এদেশের অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ নিরামিষাশী। অপরপক্ষে হিন্দুধর্মের শাক্ত শাখা আমিষভোজী হলেও বৈষ্ণব শাখা নিরামিষাশী।

কৃষিসমৃদ্ধ দেশে মানুষের খাদ্য শস্য-সবজি-দুগ্ধ-ভিত্তিক হওয়া স্বাভাবিক। বন্যা, খরা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও সাময়িক দুর্ভিক্ষ বা শস্যহানি ঐতিহাসিক কালে কৃষিজ-ফসল-ভিত্তিক খাদ্যাভ্যাসের ঐতিহ্য ব্যাহত করতে পারেনি। স্থায়ী কৃষি-ব্যবস্থায় সাধারণত প্রাচ্যের অধিবাসীরা পশুপক্ষীর মাংস আহারে অনভ্যস্ত। অস্থায়ী চাষে ও যাযাবর জীবনে মানুষকে অংশত ও প্রধানত আমিষাশী হতে দেখা যায়। এই কারণে ভারতের যেসব মানবগোষ্ঠী অস্থায়ী ও নিম্নমান চাষে নিযুক্ত বা যাদের কৃষিকার্যই প্রধান পেশা নয় তারা আমিষ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত। অনুর্বর অঞ্চলেও এদেশে তৃণভূমির চাষ হয় না বা অস্তিত্ব দেখা যায় না। পশুমাংস আহারে অনীহা এদেশের মানুষকে পশুপালক গোষ্ঠীতে পরিণত করতে পারে নি। লক্ষ করা যায়, ভারতের জনবহুল ও নদীবহুল অঞ্চলের মানুষ আমিষাশী; জনবহুল অঞ্চলে মানুষের খাদ্যাভ্যাস বহুমুখী হওয়া স্বাভাবিক। নদীবহুল অঞ্চলের মৎস্যসম্পদ স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাভাবিক নিয়মে মৎস্যভোজী করে তোলে। এই কারণে পূর্ব ভারতের অধিবাসীরা অধিকাংশই আমিষাশী।

ভারতের অধিকাংশ স্থান সমুদ্র থেকে দূরে হওয়ায় আমিষ খাদ্যাভ্যাস গড়ে উঠতে পারেনি। অতীতের পশুশিকার ও মৎস্যশিকার থেকে আমিষ খাদ্যাভ্যাসের উৎপত্তি। অরণ্য-অপসারণ ও কৃষিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পশুশিকারের অভ্যাস ভারতীয়রা বহু পূর্বেই পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু সমুদ্রোপকূলবর্তী মানুষের মৎস্যশিকার আধুনিক কালেও প্রচলিত। এদেশের অধিকাংশ স্থানের মহাদেশীয় অবস্থানের জন্য মৎস্যশিকার ও মৎস্যাহারের অভ্যাস গড়ে ওঠে নি। ফলে মহাদেশীয় ভারতের অধিকাংশ মানুষ নিরামিষাশী।

ভারতের এক জনপ্রিয় পানীয় দুধ। গ্রাম ও শহরের প্রতিটি সচ্ছল পরিবারের মানুষই দুধ পান করে থাকে। কিন্তু দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছে দুধ দুর্লভ ও দুর্মূল্য বস্তু।

ফল ও মিষ্টান্ন ভারতবাসীর বিলাস খাদ্য। পর্যাপ্ত ফলনের অভাবে জনসাধারণের এক সীমিত অংশ মাত্রই এই সব সুখাদ্য গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানকালে

ভারতীয়দের খাদ্যে ক্রমপরিবর্তন লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য প্রভাব ও জাতীয় সংমিশ্রণের ফলে পুরুষানুক্রমিক খাদ্যাভ্যাসে সর্বত্র ধীর ও দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ করার মত।

বেশভূষা

ভারতীয় কৃষ্টির সহনশীলতার পরিচয় নানাজাতীয় বেশভূষার সহ-অবস্থান। এদেশের বেশবাসে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককালের সর্বকালীন বেশভূষার স্বাক্ষর মেলে। অরণ্যের অনেক আদিম অধিবাসী এখনও প্রায় নগ্ন। অনেকের প্রধান সজ্জা শুধু কটি-বাস। উষ্ণ জলবায়ু অধিবাসীদের এই স্বল্পবাসের প্রধান কারণ। ঐতিহাসিক যুগ থেকে ভারত নানাজাতীয় বস্ত্র উৎপাদনে খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্য লাভ করলেও জলবায়ুগত কারণে ভারতবাসীর এক বৃহৎ অংশ প্রায় নিরাবরণ।

পোশাকের ব্যবহারে সূতীবস্ত্রই প্রধান। একমাত্র উত্তরের শীতল ও পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া পশমজাত দ্রব্যের ব্যবহার অন্যত্র কম। দক্ষিণের উষ্ণ আবহাওয়ায় পশমবস্ত্রের ব্যবহার বিরল।

ভারতের জাতীয় পোশাকের মধ্যে ধুতি, শাড়ী, লুঙ্গি, শালোয়ার, চুড়িদার, কামিজ, চোলি, কুর্তা, লম্বা কোট বা আচকান, শার্ট, পাঞ্জাবী, পাগড়ি এবং গান্ধীটুপি উল্লেখ-যোগ্য। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই সব বেশভূষার মধ্যে বিদেশের প্রভাব যথেষ্টই লক্ষণীয়।

ভারতীয় পুরুষের মুক্তকচ্ছ ধুতি পরিধানে মিশর, সুমের ও ক্রীট প্রভৃতি প্রাচীন জগতের পরিধেয়র সাদৃশ্য দেখা যায়। উল্লিখিত দেশসমূহের প্রাচীরগাত্রে পুরুষের পরিধেয় অনুরূপ হ্রস্ব ও কচ্ছযুক্ত ছিল।

ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায় যে পারসিক, ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক, কুষাণ, শক, হূণ প্রভৃতি জাতির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাজপরিবার ও উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়দের মধ্যে নানাজাতীয় পরিধেয়র প্রবর্তন ঘটে। যেমন, পারসিক জমকালো ও রেশমী পোষাক এবং পাগড়ি মৌর্য যুগ থেকে ভারতে ব্যবহার হয়ে আসছে। ব্যাকট্রিয়ান গ্রীকদের সময় থেকে ভারতে সীবন পদ্ধতি প্রচলিত হয়। কুষাণ যুগে বোতাম লাগানো কোট, পাতলুন ও চোস্ত ব্যবহার শুরু হয়। এই সময় থেকেই মেয়েরা ব্লাউজ, স্কার্ট ও ফ্রক পরা শুরু করে। এসব পরিধেয় কুষাণ মুদ্রা ও অজন্তা গুহাচিত্রে পাওয়া যায়। কুষাণদের হ্রস্ব জামা থেকেই পরে 'চোলি' প্রবর্তিত হয়। হূণ আমলে মধ্য এশিয়ার ঘাঘ্‌রা ও কারুকার্যখচিত বেশভূষা এদেশে প্রচলিত হয়।

মুসলমান আমলে সর্বস্তরের ভারতীয় পোশাকে মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাব লক্ষ করার মত। পাগড়ি, আঁটজামা, শালোয়ার, চোস্ত, কামিজ, কোমরবন্ধ, ওড়না, শাল প্রভৃতির ব্যবহার এসময় থেকে শুরু হয়। মেয়েদের ঘোমটার প্রচলনও এসময় থেকেই শুরু।

মুসলমান শাসনের পর প্রকৃতপক্ষে মেয়েদের পোশাকের স্থায়ী পরিবর্তন হয়।

সুদৃশ্য শাড়ী ও তা পরিধানের কুশলতা কিভাবে প্রচলিত হয় তা আজও রহস্যাবৃত। অতীতের মেয়েরা নিম্নাঙ্গ ও উর্ধ্বাঙ্গের জন্য দুইখণ্ড বস্ত্র বা পৃথক আবরণ ব্যবহার করতেন। এখনও মণিপুরে লুঙ্গি-চাদর, রাজস্থানে ঘাঘ্‌রা-ওড়না ও আসামে রিয়া-মেখলা প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু বর্তমানের ৫ মিটার বস্ত্রের সাহায্যে সুন্দরভাবে শাড়ী পরিধান অতীতে কোন সময়েই দেখা যায় নি। মুসলমান আমলের পরে শাড়ী পরিধানের এই আধুনিক পদ্ধতি জৈন ও পাল যুগের নানা চিত্রে দেখতে পাওয়া যায়। সীবনহীন বস্ত্রের ব্যবহার নানাদেশে প্রচলিত থাকলেও শাড়ীর ব্যবহার ভারতের স্বকীয়তার পরিচয়।

দক্ষিণ ভারতে গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা ও শহরাঞ্চলের প্রবীণারা প্রাচীন পদ্ধতিতে দীর্ঘতর শাড়ী ব্যবহার করেন। এই শাড়ীর এক অংশ তাঁরা পুরুষের ধুতির কোঁচার মত ও বাকী অংশ সাধারণ শাড়ীর মত করে পরেন।

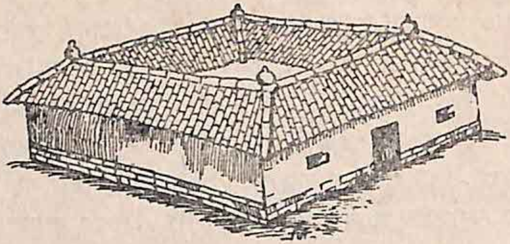
ইউরোপীয়দের আগমনের ফলে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতের নারী ও পুরুষের পোশাকে পাশ্চাত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। পুরুষের শার্ট, হাওয়াই শার্ট, প্যান্ট, কোট, সুট এবং মেয়েদের ফ্রক, স্কার্ট, গাউন, ম্যাক্সি প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রভাবের লক্ষণ।

পূর্ব এশিয়ার সারোঙ্ বা লুঙ্গির ব্যবহার মণিপুর ও অন্যত্র সব পুরুষের পরিধানে লক্ষণীয়। পূর্ব ভারতে খাসি, গারো, নাগা প্রভৃতি জাতির পোশাকের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ-যোগ্য। খাসি মেয়েদের দুই খণ্ড বস্ত্রের সাহায্যে কাঁধ থেকে হাঁটুর নিচ অবধি দীর্ঘ প্রলম্বিত পোশাকে কতকটা সিকিম, ভুটান ও তিব্বতের প্রভাব লক্ষ করা যায়। পুরুষের পোশাকে আধুনিকতার লক্ষণ দেখা গেলেও মেয়েরা আজ পর্যন্ত পুরোনো পদ্ধতিতে সজ্জা করেন। গারো ও নাগারা বস্ত্রখণ্ড স্কার্টের মত করে হাঁটু পর্যন্ত পরে থাকেন। অতীতে তাঁরা বক্ষাবরণ ব্যবহার করতেন না। কিন্তু বর্তমানে পৃথকভাবে তাঁরা বক্ষ আচ্ছাদন করে থাকেন। ভারতের অন্যত্র উপজাতীয়রা বস্ত্রখণ্ড শাড়ী ও ধুতির মত পরিধান করেন।

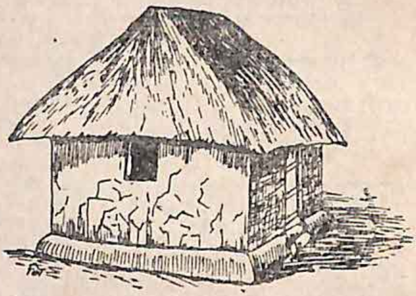
ভারতীয় বেশভূষায় অলঙ্কারের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এদেশের সর্বস্তরের মেয়েরাই নানা ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করতে ভালবাসেন। দরিদ্র ও স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরা কাঁচ, পুঁতি, পাথর ও রূপোর অলঙ্কার ব্যবহার করেন। অপেক্ষাকৃত বিত্তবানেরা সোনা ও মণিমুক্তোর অলঙ্কার পরে থাকেন।

বাসগৃহ

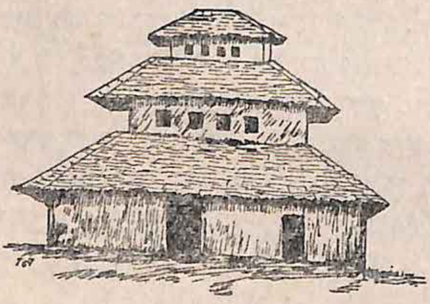
বাসগৃহের বিভিন্নতা প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণের ওপর নির্ভরশীল। উপকরণের সহজলভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানা শ্রেণীর বাসগৃহ গড়ে উঠতে দেখা যায়।



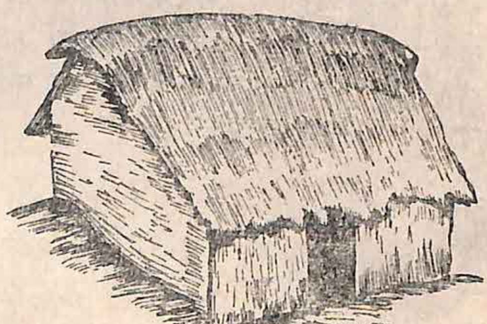
সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের
খোলার বাড়ি



মাটির চৌচালা কুটির



সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের
টালির বাড়ি

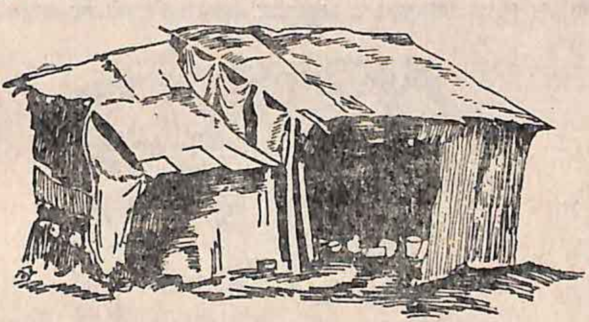


দরিদ্র পরিবারের দোচালা
কুটির

ভারতে অধিকাংশ বাসগৃহ নির্মাণে মাটি, বেড়া, কাঠ, পাথর, শণ, খড়, পাতা, টালি ইত্যাদির ব্যবহার ব্যাপক। এছাড়া ইট, সুরকি, অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌, টিন প্রভৃতিও সীমিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শহরাঞ্চলে অধিকাংশ বাসগৃহ ইট, চুন, বালি, সুরকি প্রভৃতি দিয়ে তৈরি।

বাড়ির গড়ন, অর্থাৎ দেওয়ালের বেধ, ছাদের আকৃতি, দরজা-জানালার সংখ্যা ও বিন্যাস প্রভৃতি বহুলাংশে জলবায়ু ও অর্থনৈতিক কারণের ওপর নির্ভরশীল। যেমন, চরম ভাবাপন্ন জলবায়ুতে শীতাতপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মাটির দেওয়াল পুরু করা হয়। সঙ্গতি থাকলে ইটের দেওয়ালও অনুরূপভাবে প্রশস্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু বেড়া ও কাঠের দেওয়াল সাধারণত পুরু করা হয় না। শীতাতপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সনাতন পদ্ধতির বাড়িতে দরজা-জানালার সংখ্যা কম থাকে। বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি উষ্ণ স্থানে জানালার আকার ক্ষুদ্র হয় ও তা প্রায় ছাদের নিচেই স্থাপন করা হয়। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে ছাদ ঢালু করা হয়। কিন্তু ইটের বাড়ির ছাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমতল হতে দেখা যায়। শুষ্ক ও তুষারপাত অঞ্চলে মাটি, কাঠ ও পাথরের সাধারণ বাড়ির ছাদ সমতল হতে পারে। কাশ্মীরের লাদাখ অঞ্চলে ও মহারাষ্ট্র-মহীশূরের শুষ্ক অঞ্চলে এই ধরনের ছাদ লক্ষণীয়।

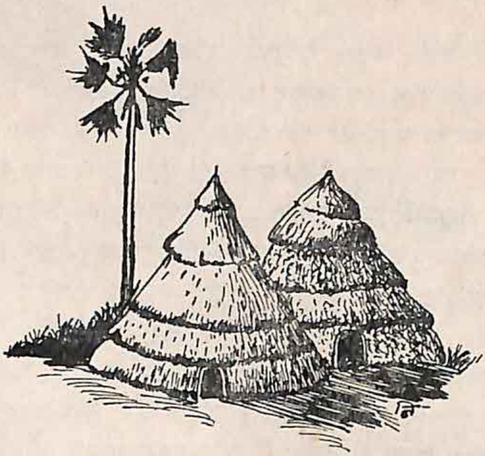
অর্থনৈতিক কারণে বাসগৃহের আয়তন, ছাদের নমুনা ও নির্মাণোপকরণে তারতম্য লক্ষ করার বিষয়। গ্রামাঞ্চলে মাটির কুটিরেরই প্রাধান্য; অবস্থাভেদে এইসব কুটির এক বা একাধিক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। দরিদ্র পরিবারের বাসকুটির সাধারণত ক্ষুদ্র। কিন্তু সঙ্গতিপূর্ণ পরিবারের কুটির তিন চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হতে পারে। বাসগৃহে বেড়া, কাঠ ও ইটের ব্যবহার নিঃসন্দেহে পরিবারের সঙ্গতির প্রমাণ।



দরিদ্র পরিবারের একচালা কুটির

ছাদের আকৃতিও দরিদ্রগৃহে একচালা বা দোচালা পর্যন্ত হতে পারে। অপরপক্ষে অবস্থাপন্ন ঘরে তা চৌচালা থেকে আটচালা পর্যন্ত হতে দেখা যায়। একই কারণে খড়, শণ ও পাতা দিয়ে দরিদ্ররা গৃহ আচ্ছাদন করলেও সঙ্গতি-সম্পন্ন ঘরের বাড়ি

টালি, টিন, অ্যাসবেস্‌টস্‌ ও ইট দিয়ে তৈরি হয়, এমন কি শহরাঞ্চলেও অধিকাংশ বাড়ি ইটের তৈরি হলেও দরিদ্রবস্তির বাড়িঘর মাটি-টালি-টিন প্রভৃতি দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে।



অন্ধ্রের গোলাকার কুটির

বাসগৃহের নমুনায় পূর্ব থেকে পশ্চিমে ও উত্তর থেকে দক্ষিণে নানা পার্থক্য প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও ঐতিহাসিক কারণের ওপর নির্ভরশীল। ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথে বিভিন্ন মানুষের ধারা গৃহনির্মাণের বিচিত্র কলা এদেশে বহন করে আনে। পশ্চিম থেকে গিরিপথে ও সমুদ্রপথে প্রধানত বিদেশীদের আগমন ঘটলেও



আসামের বাসগৃহ

পূর্ব ও উত্তর থেকেও বিভিন্ন সময়ে মোঙ্গল জাতির অনুপ্রবেশ ঘটে। এই কারণে পশ্চিম ভারতে মধ্য-প্রাচ্য ও আফ্রিকার বাসগৃহের সঙ্গে, দক্ষিণ ভারতে মধ্য প্রাচ্য-

আফ্রিকা ছাড়াও ইউরোপের সঙ্গে এবং পূর্ব ও উত্তরে পূর্ব-প্রাচ্য ও পার্বত্য মধ্য-এশিয়ার বাসগৃহের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের প্রাচীর বেষ্টিত বাসগৃহে পারস্যের প্রভাব, গোলাকার বাসগৃহে আফ্রিকার প্রভাব, উত্তরের কাঠের ও পাথরের বাড়িতে পার্বত্য মধ্য-এশিয়ার প্রভাব এবং



কাশ্মীরের বাসগৃহ

পূর্বে বাঁশ ও মাচা-গৃহে পূর্ব-প্রাচ্যের প্রভাব এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে গৃহনির্মাণে পর্তুগীজ ও আফ্রিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের নির্মাণকলা পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব উপকূলের নির্মাণকলায় ফরাসী ও ব্রিটিশ প্রভাব লক্ষণীয়। বর্তমানে ভারতের সর্বত্র শহরাঞ্চলে ও অন্যত্র গৃহনির্মাণে ইউরোপের প্রভাব বিশেষ ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।



অন্ধ্র, রাজস্থান, গুজরাটের গোলাকার কুটির

নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও মোটামুটিভাবে ভারতে গ্রামাঞ্চলে মাটির কুটিরের সংখ্যা সর্বাধিক। এইসব কুটির অধিকাংশ ক্ষেত্রে খড় ও শণ দ্বারা আচ্ছাদিত। যদিও খড় ও শণ বারংবার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তথাপি শস্য-উৎপাদনের নিশ্চয়তা

হেতু এই আচ্ছাদনের ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা লক্ষণীয়। শহরাঞ্চলে ইটের বাড়ি এখন পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের ধরনে বহুতলবিশিষ্ট নয়। তবে বাসযোগ্য জমির স্বল্পতাহেতু বর্তমানে জনাকীর্ণ শহরে গগনচুম্বী প্রাসাদ ও বহুফ্ল্যাটবিশিষ্ট বাড়ি নির্মিত হচ্ছে।

ভাষা

ভারতের নানা অঞ্চলের মানুষের নানা ভাষা। ভারতীয় সংবিধানে ১৫টি প্রধান ভাষা স্বীকৃত। যেমন, অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটী, হিন্দি, কানাড়ী, কাশ্মীরী, মালয়ালম, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, তামিল, তেলেগু, উর্দু ও সংস্কৃত। কিন্তু কথ্য ভাষার মোট সংখ্যা ১৬৫২। এর মধ্যে ১০৩টি অভারতীয় ভাষাও অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর কোন দেশেই হয়ত এতগুলি ভাষার সমাবেশ দেখা যায় না। ভাষা-বৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ এদেশের নানা জাতি ও উপজাতির সমাবেশ।

মোটামুটিভাবে ভারতের ভাষাসমূহকে কতগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ঐতিহাসিক ভিত্তিতে বা প্রাচীনতার ভিত্তিতে এদেশের ভাষাপঞ্জী নিম্নরূপ :

১। **কোলারীয় ভাষা :** ভারতের আদি অধিবাসীদের, কোল, মুণ্ডা, ভীল, সাঁওতাল, কুরকু, ওরাঁও, খেরোয়ারী ও নিকোবরী প্রভৃতি উপজাতির ভাষা কোলারীয়। ঈস্টার দ্বীপ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার সম্বন্ধ বর্তমান।

২। **ইন্দোচীনীয় ভাষা :** উত্তরপূর্ব পার্বত্যাঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর, হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলের তিব্বতী-বর্মী জাতির ও খাসি জাতির ভাষা এই শ্রেণীর।

৩। **দ্রাবিড় ভাষা :** আর্যজাতির আগমনের আগে দক্ষিণ ভারতে এই ভাষা ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিল। একসময় মনে করা হত এই ভাষার সঙ্গে তুরাণীয় ও অস্ট্রিয়াক ভাষার সম্পর্ক আছে। কিন্তু বর্তমানে বলা হয় ককেশীয় ও সুমেরীয় ভাষার সঙ্গে এর সাদৃশ্য বেশি। দ্রাবিড় ভাষা এখনও পশ্চিমে গুজরাট থেকে কুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং উত্তর ভারতেরও কোন কোন ভাষায় এর অস্তিত্ব নিহিত। এই ভাষার দুটি শাখার মধ্যে তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ও কানাড়ী প্রভৃতি পরিমার্জিত দ্রাবিড় ভাষা এবং অন্য শাখা আদি দ্রাবিড় বা অপরিমার্জিত দ্রাবিড় ভাষা।

দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে তামিল সমৃদ্ধতম ভাষা। অপরপক্ষে তেলেগু একটি শ্রুতিমধুর ভাষা। বিজয়নগর রাজ্যের দরবারী ভাষা ছিল তেলেগু। দ্রাবিড় ভাষার মালয়ালম শাখায় সংস্কৃতের প্রভাব অধিক। মহীশূর, কানাড়া ও মালাবার উপকূলে কানাড়ী ভাষার প্রচলন লক্ষণীয়। অপরিমার্জিত দ্রাবিড়ভাষার ব্যবহার ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। এই পরিণতির প্রধান কারণ লিখিত ভাষার অভাব। টোডা, রাজমহল, মল্টো, গণ্ড, কোদাগু, কান্দ (খণ্ড), কোলামি প্রভৃতি জাতি নীলগিরি, রাজমহল, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশায় এই ভাষা ব্যবহার করেন।

খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে আর্যদের ভারত আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 'ইন্দো-আর্য' ভাষার আবির্ভাব ঘটে। অভেস্তা, বেদ, সংস্কৃত প্রভৃতি আদি প্রাকৃত বা 'ইন্দো আর্য' ভাষা। এরপর প্রাকৃত ইন্দো-আর্য ভাষা ক্রমশ অপভ্রংশ হয়ে নতুন বা আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষার জন্ম দিয়েছে। বর্তমানে ভারতে আর্যভাষার শ্রেণীবিন্যাস নিম্নরূপ:

কাশ্মীরী: উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রাকৃত ভাষা থেকে এই ভাষা উদ্ভূত।

লাণ্ডা: পাঞ্জাবে এই ভাষার প্রচলন দেখা যায়।

সিন্ধি: পশ্চিম ভারতের এই ভাষার সঙ্গে পারসিক ভাষার সাদৃশ্য বর্তমান।

গুজরাটী: গুজরাটের সমৃদ্ধ ভাষা গুজরাটী। গুর্জর ও সিদীয় জাতির ভাষার প্রভাব এতে বর্তমান।

রাজস্থানী: রাজস্থানের এই ভাষায় কোমলতার অভাব লক্ষণীয়। মাড়োয়াড়ী, জয়পুরী, মেবারী ও উদয়পুরী এর বিভিন্ন শাখা।

পাঞ্জাবী: পাঞ্জাবের এই ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব সামান্য।

হিন্দি: পশ্চিমী ও পূবীয় হিন্দি--হিন্দিভাষার দুটি শাখা। গঙ্গা-যমুনা অঞ্চলের পশ্চিমী-হিন্দি পারসিক প্রভাবিত। পূবীয় হিন্দি বা 'কোশলী' ভাষা গঙ্গার পূর্বভাগে ও ছত্রিশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত।

মারাঠী: মহারাষ্ট্রের এই ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

বিহারী, ওড়িয়া, বাংলা ও **অহমীয়া** প্রভৃতি ভাষা যথাক্রমে বিহার, ওড়িশা, পশ্চিম-বঙ্গ, আসাম রাজ্যে প্রচলিত। বিহারী ভাষার নানা শাখার মধ্যে ভোজপুরী, মগধী ও মৈথিলীর নাম উল্লেখযোগ্য। ওড়িয়া ভাষার মিষ্টত্ব সর্বজনবিদিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের সম্পদ ও বিকাশ

কৃষিকার্য

ভারত প্রধানত কৃষিনির্ভর দেশ। যুগ যুগ ধরে এদেশের কৃষিসমৃদ্ধি সারা বিশ্বকে আকৃষ্ট করেছে। এখনও এখানকার ৬৯·৫০ শতাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী। পর্বত, বনভূমি, রুদ্রভূমি ও পতিতভূমিকে বাদ দিয়ে এদেশের কর্ষিত জমির পরিমাণ ৪৫ শতাংশ। কিন্তু দো-ফসলা জমি (৬·০ শতাংশ) সহ মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ৫১ শতাংশ।

ভারতের কৃষিব্যবস্থার নানা প্রকার শ্রেণীবিন্যাস সম্ভব। যথা:

(১) স্বয়ংভোগী কৃষি
(২) বাণিজ্যিক কৃষি বা বাগিচা কৃষি, অথবা
(১) নিবিড় চাষ
(২) ব্যাপক চাষ, অথবা
(১) স্থায়ী চাষ
(২) অস্থায়ী চাষ ও ঝুম চাষ

স্বয়ংভোগী কৃষি বলতে চাষী ও চাষী-পরিবারের প্রয়োজনে উৎপন্ন ফসলের চাষকে বোঝায়। এই কৃষিব্যবস্থায় সামান্য উদ্বৃত্ত থাকতে পারে, যা একমাত্র স্থানীয় চাহিদা মেটাতে ব্যয় হয়। স্বয়ংভোগী কৃষির ফসল বহির্বাজারে প্রায় প্রবেশ করে না বললেই চলে। অর্থাৎ এই কৃষির কোন বাণিজ্যিক গুরুত্ব নেই।

বাণিজ্যিক ও বাগিচা কৃষি প্রধানত বহির্বাণিজ্যের জন্যই। স্থানীয় প্রয়োজনে এর উৎপাদন খুব কমই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ স্থানীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফলন এই কৃষির লক্ষণীয় বিষয়। বাগিচাকৃষির বৈশিষ্ট্য এই যে একবার এই ফসলের বীজ বা চারা রোপণ করে কয়েক বছর ধরে তা থেকে ফসল আহরণ করা যায়। যেমন, চা, কফি, সিঙ্কোনা, কলা ইত্যাদি।

ঘনবসতি অঞ্চলে, যেখানে জমির পরিমাণ কম, সেখানে অল্প পরিসরে যথেষ্ট ব্যয় ও পরিশ্রমে যে অধিক ফলনের চাষ হয় তাকে নিবিড় চাষ বলে। পক্ষান্তরে অধিক পরিসরে সামান্য ব্যয় ও পরিশ্রমে যে সাধারণ মানের চাষ হয় তাকে ব্যাপক চাষ বলে। ব্যাপক চাষ অপেক্ষাকৃত স্বল্পবসতি অঞ্চলে দেখা যায়। নিবিড় চাষের

জমি উর্বর শ্রেণীর ও ব্যাপক চাষের জমি অপেক্ষাকৃত কম উর্বর বা অনুর্বর শ্রেণীর হতে দেখা যায়।

ভারতের অধিকাংশ স্থান স্থায়ী চাষের অন্তর্গত। কোন চাষী বা চাষী-পরিবার যখন বছরের পর বছর ধরে এক স্থানে বসবাস করে চাষবাস করে—তাকে স্থায়ী চাষ বলে। অপরপক্ষে সে যখন অবিরত স্থান পরিবর্তন করে কৃষিকার্য চালায় তাকে অস্থায়ী চাষ বলে। এর একশ্রেণীর নাম ঝুম চাষ। ঝুমচাষে পর্বতগাত্রের বা মালভূমির অরণ্য কেটে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এভাবে যে নবীন জমির সন্ধান মেলে সেখানে কয়েক বছর কৃষিকার্যের পর চাষীরা অন্যত্র চলে গিয়ে আবার সেখানে একই প্রথায় কৃষিকার্য করে। পরিত্যক্ত জমি তখন আবার অরণ্যভূমিতে পরিণত হয়। এইভাবে অবিরত স্থান পরিবর্তন করে এক সময় এই জাতীয় চাষীরা আবার প্রথম বা পুরাতন স্থানে ফিরে আসে। এই চাষকে ঝুম চাষ বলে। অরুণাচলে ও মধ্যভারতের পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চলে এ ধরনের চাষ হয়।

এদেশের কৃষিসম্ভার বহুবিধ। এই সম্ভারের মধ্যে ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, রাগী ও নানাবিধ ডাল প্রভৃতি খাদ্যফসল প্রধান। অন্যান্য খাদ্যফসলের মধ্যে আখ, তৈলবীজ, নারকোল, তাল, খেজুর, পান ও নানাজাতীয় ফল ও মশলা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসলের শ্রেণীভুক্ত।

তুলো, পাট, পশম, রেশম, তামাক, চা, কফি, রবার, সিঙ্কোনা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ও বাগিচা ফসল।

পশুপালন ভারতের কৃষিকার্যের একটি বিশেষ দিক। এছাড়া বনপালন ও মৎস্যচাষও কৃষিকার্যের অন্যান্য দিক। উল্লিখিত সর্বপ্রকার উৎপাদন এদেশের কৃষিকার্যকে নানাভাবে গুরুত্বদান করেছে।

ধান: খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানের স্থান ভারতে প্রথম। প্রায় ৮৫০ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হয়। সমবর্ষণরেখার সঙ্গে ধানবলয়ের একটা গভীর যোগাযোগ লক্ষ করা যায়। ২০০সে সমবর্ষণরেখার অন্তর্বর্তী অঞ্চলে ধানই প্রধান ফসল। ১০০সে থেকে ২০০সে সমবর্ষণরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে জলসেচের সাহায্যে ধান উৎপন্ন হয়। এই কারণে নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমিতে ও পূর্ব উপকূলীয় বদ্বীপসমূহে ধানের অধিক ফলন দেখা যায়। মোটামুটিভাবে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, বিহার, ওড়িশা, তামিলনাড়ু এবং উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের পূর্বভাগে ধান জন্মায়। এছাড়া পশ্চিম উপকূলে ও পার্বত্যভূভাগের আর্দ্র অঞ্চলে সোপান চাষের মাধ্যমেও কিছু পরিমাণ ধান জন্মে থাকে (মানচিত্র ১)।

ভারতে প্রায় ৪০০০ প্রকারের ধান জন্মায়। সর্বপ্রকার ধানের মধ্যে নিম্নভূমি ও উচ্চভূমির ধান উল্লেখযোগ্য। ধানচাষে 'অবাধনিক্ষেপ' পদ্ধতি (broadcasting method) ও পুনর্রোপন পদ্ধতি (transplantation method) এই দুই প্রথার

প্রাধান্য লক্ষণীয়। ধানের অঙ্কুরিত বীজ যখন অবাধে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে, পরে তা কিছুটা পরিষ্কার করে বিচ্ছিন্নভাবে রোপণ করা হয় তাকে 'অবাধ নিক্ষেপ' চাষ বলে। 'পুনর্রোপণ' প্রথায় ধান চাষ স্বতন্ত্র। প্রথমে ধানের বীজ 'চারা উৎপাদন ক্ষেত্রে' রোপণ করা হয়। এই ক্ষেত্রে পরিমিত জল ও সার দিয়ে তা চারা উৎপাদনের উপযুক্ত করে তোলা হয়। সারের মধ্যে গোময়, জৈবসার ও নাইট্রোজেন জাতীয় সার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চার পাঁচ সপ্তাহ এইক্ষেত্রে ধানচারা পালন করা হয়। ইতোমধ্যে একাধিকবার লাঙল দিয়ে ধানচাষের জমি যত্ন করে মিহি করে তৈরি করা হয় ও পরে ধানচারা উৎপাটিত করে এই জমিতে সারিবদ্ধভাবে ৮।১০ ইঞ্চি তফাতে রোপণ করা হয়। এই পুনর্রোপণ প্রথায়, 'অবাধনিক্ষেপ' পদ্ধতির চেয়ে কম বীজের প্রয়োজন হয় এবং এর ফলনও অনেক অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে।

ঋতুকালীন ফসল হিসাবে ধানকে পুনরায় আউস, আমন ও বোরোধানে বিভক্ত করা সম্ভব। শীতের শেষে নিচু জমিতে আউস ধান বোনা হয় ও অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে তা সংগৃহীত হয়। অবাধনিক্ষেপ আমন শীতের শেষে রোপণ করে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে উত্তোলন করা হয়। কিন্তু পুনর্রোপণ আমন জুন মাসে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে রোপণ করে, জুলাই-অগস্ট মাসে তা পুনর্রোপণ করা হয়। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এই ধান তোলা হয়। বোরো ধান বর্ষার শেষে নভেম্বর মাসে বোনা হয় ও মার্চ-এপ্রিলে তা কাটা হয়। আউসের মত বোরোও নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধান।

জলবায়ু অনুকূল হলে প্রায় সারা বছর এভাবে ধান জন্মাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অনেক জায়গায় প্রায় সারা বছর ধান জন্মায়। ১৯৭২ সালে ভারতে ৩৪০ লক্ষ টনের অধিক ধান উৎপন্ন হয়েছিল।

গম: গম উৎপাদনে জলবায়ুর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। সাধারণভাবে যে সব অঞ্চলে শীতকাল বেশ শীতল সেখানেই সার্থকভাবে গম জন্মায়। বর্ষার শেষে অক্টোবরে গম রোপণ করা হয় ও তা মাঠে চার-পাঁচ মাস পর্যন্ত থাকে। দক্ষিণ-ভারতে জানুয়ারি মাস থেকে গম তোলা শুরু হয় ও উত্তর ভারতে তা এপ্রিল মাসের শেষে উত্তোলিত হয়ে থাকে।

পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং বিহারে প্রধানত গম উৎপন্ন হয়। এছাড়া তামিলনাড়ু, মহীশূর, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট গম জন্মায়। সিন্ধু-গঙ্গা-সমভূমির পলিমাটি ও মধ্যভারতের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল গম উৎপাদনের উৎকৃষ্ট স্থান (মানচিত্র ১)। আর্দ্র অঞ্চল গমের ফসলের অনুকূল নয়।

ভারতে মোট ৩৩৪ লক্ষ একর জমিতে প্রায় ১২০ লক্ষ টন গম (১৯৭১-৭২) উৎপন্ন হয়।

জোয়ার, বাজরা, রাগী: জোয়ার খারিফ ও রবিশস্য হিসাবে বছরে দু'বার জন্মায়। এর চাষের জন্য ৭৫ থেকে ১০০ সে বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। ভারতে কৃষ্ণমৃত্তিকা

অঞ্চলে জোয়ারের ফলন ভাল হয় ও তা তুলোর সঙ্গে চক্রাবর্তে উৎপাদিত হয়। তবে রবি জোয়ারের ফলনে এরকম কোন আবর্তন অনুসরণ করা হয় না। তামিলনাডু, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মধ্যভারত, রাজস্থান ও গুজরাটে জোয়ারের প্রাধান্য লক্ষণীয়। জাবশস্য (fodder crop) হিসাবে জোয়ারের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

জোয়ার অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমিতে বাজরা জন্মায়। লাভা অঞ্চলের উচ্চভূমিতে ও অন্যত্র বালুকাময় ও প্রস্তরময় জমিতে বাজরার চাষ হয়। অধিক বৃষ্টি বাজরার পক্ষে ক্ষতিকর। খারিফ শস্য হিসেবে এর চাষ হলেও মাত্রাতিরিক্ত বর্ষণের পর তা রোপণ করা হয়। প্রায় সর্বত্র ডালের সহশস্য হিসাবে বাজরা উৎপাদিত হয়। তবে কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে জোয়ারের সঙ্গে চক্রাবর্তেও জন্মে থাকে।

রাগী বা মারুয়া হিমালয়ের ঢাল থেকে দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত খারিফ শস্যরূপে জন্মে থাকে। এর চাষে পুনর্রোপণ ও ক্ষেত্রবিশেষে সেচের প্রয়োজন হয়। দাক্ষিণাত্যে জলাধারপূর্ণ অঞ্চলে রাগীর ফলন লক্ষ করার মত। শুষ্ক রাগী প্রায়শ অন্য শস্যের সঙ্গে ফলে থাকে ও এর ফলনে কোন সেচের প্রয়োজন হয় না। দরিদ্র শ্রেণীর জন্য রাগী সর্বপ্রধান খাদ্যশস্য। তেলেঙ্গানা ও তামিলনাডুতে এর উৎপাদন বেশি (মানচিত্র ১)।

ভুট্টা: শুষ্ক ও নিকৃষ্ট অঞ্চলে ভুট্টা একটি নিকৃষ্ট ফসল। কিন্তু ভারতে ভুট্টার স্থান আশানুরূপ নয়।

ডাল: ডাল একটি উত্তম প্রোটীন শস্য। নানা শ্রেণীর ডাল ভারতের প্রিয় খাদ্য। এই শস্য অন্যান্য শস্যের সঙ্গে উৎপাদিত হয়। উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে অধিক ফলন হলেও ভারতের প্রায় সর্বত্র ডাল জন্মে থাকে।

বার্লি: গম ছাড়া ভারতের একমাত্র উল্লেখ্য শীতকালীন ফসল বার্লি। উচ্চ-হিমালয় ও উত্তরপ্রদেশে বার্লি জন্মে থাকে। উচ্চ-হিমালয়ের নগ্ন-তিব্বতী বার্লি উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্যিক ফসল

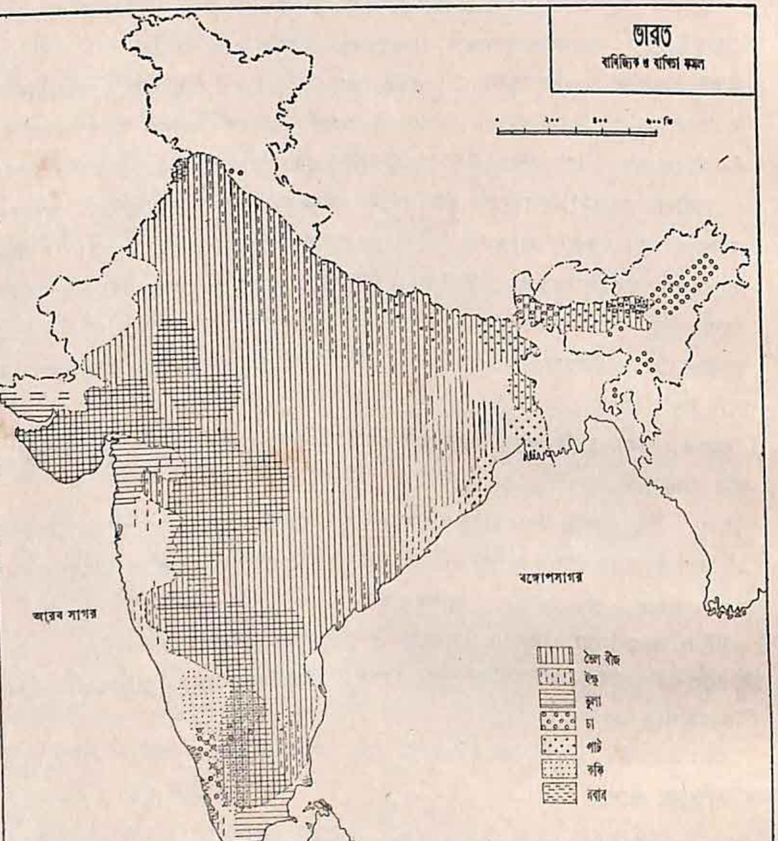
বাণিজ্যিক ফসলকে খাদ্যফসল, তন্তুফসল, শিল্পফসল ও বাগিচাফসল প্রভৃতি নানা ভাগে ভাগ করা সম্ভব।

বাণিজ্যিক খাদ্যফসলের মধ্যে আখ, তৈলবীজ, আলু, নানাবিধ ফল, নারকোল, তাল, খেজুর, সুপারি, পান, বিভিন্ন প্রকারের মশলা ও সবজি উল্লেখযোগ্য।

তন্তুফসলের মধ্যে তুলো, পাট, রেশম ও পশম প্রধান। শিল্পফসল বলতে তুলো, পাট, পশম ও রবারের নাম করা যায়। বাগিচাফসল হিসাবে চা, কফি, সিঙ্কোনা, রবার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

আখ বা ইক্ষু: ভারতে প্রায় ৫০ লক্ষ একর জমিতে আখের চাষ হয়। আখ

উৎপাদনে সমগ্র বিশ্বে ভারতের স্থান প্রথম। অল্পবিস্তর সর্বত্র আখ জন্মালেও উত্তর-প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, পূর্ব-পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, মহীশূর ও ওড়িশায় এর অধিক ফলন হয় (মানচিত্র ২)। উত্তরবিহার থেকে পূর্বপাঞ্জাব পর্যন্ত পলি-বলয় আখ উৎপাদনের প্রশস্ত ক্ষেত্র।



মানচিত্র ২

তৈলবীজ: তৈলবীজ উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান প্রথম। কর্ষিত জমির প্রায় দশ শতাংশ অংশে এর ফলন হয়। চীনাবাদাম, সরিষা, তিসি, তিল, রেড়ি প্রভৃতি নানা জাতীয় তৈলবীজ। এদের মধ্যে চীনাবাদাম সবচেয়ে ব্যাপকভাবে উৎপন্ন হয়। হালকা বেলে-মাটি চীনাবাদামের পক্ষে অনুকূল। এই শস্য গ্রীষ্মকালীন ফসল। তিল প্রায় ভারতের সর্বত্র জন্মায়। কিন্তু খুব আর্দ্র অঞ্চলে এর ফলন

সম্ভব নয়। ভারতবাসীর এক বৃহৎ অংশ তিল তেল ব্যবহার করে থাকে। সরিষা প্রধানত পূর্বভারতে খারিফ ও রবিশস্য হিসাবে জন্মায়। হালকা মাটি খারিফ সরিষা ও ভারী মাটী রবি সরিষার উপযোগী। ভারতে প্রায় সর্বত্র কোন না কোন তৈলবীজ জন্মে থাকে (মানচিত্র ২)।

আলু: ভারতীয়দের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় আলু একটি জনপ্রিয় ফসল। সাধারণত প্রবেশ্য মাটি বা দো-আঁশ মাটিতে আলু জন্মে থাকে। আর্দ্র আবহাওয়া আলুর অনুকূল নয়। তাই এই ফসল রবিশস্য হিসাবেই জন্মায়। হিমালয়ের পর্বতঢালে উৎকৃষ্ট আলুর চাষ হয়। এছাড়া উত্তর ভারতের দো-আঁশ মাটিতে সর্বত্র কিছু না কিছু আলুর চাষ হয়। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতেও যথেষ্ট আলুর চাষ হচ্ছে।

নারকোল: সমুদ্রসান্নিধ্যে লবণাক্ত জমিতে ভাল জন্মালেও মহারাষ্ট্র, গোয়া, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তর ভাগেও যথেষ্ট নারকোল জন্মায়। দক্ষিণ ভারতে প্রচুর নারকোল জন্মালেও কেরালার প্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত।

তাল, খেজুর ও সুপারি: ভারতের পার্বত্য ভূভাগ ছাড়া প্রায় সর্বত্র জন্মায়। মরুভূমি ও মরুপ্রায় অঞ্চলে তাল ও সুপারি না জন্মালেও খেজুর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জন্মে থাকে।

ফল ও মশলা: নানাবিধ ফলের মধ্যে কলা, আম, পেয়ারা, পেঁপে, জাম, কাঁঠাল, আনারস, কমলালেবু, আপেল, আঙুর, তরমুজ, খরমুজ, ও নাসপাতি উল্লেখযোগ্য। ভারতের নানাবিধ সুস্বাদু আমের খ্যাতি সর্বজনবিদিত।

মশলার মধ্যে লঙ্কা, ধনে, আদা, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ ও অন্যান্য বহু প্রকার জিনিসের নাম করা যায়। সীমিত অঞ্চলে মশলা উৎপন্ন হলেও এর গুরুত্ব আছে।

পান: এই ফসল সর্বভারতে সুপরিচিত। ভারতে এমন স্থান নেই যেখানে অল্প-বিস্তর পানের দোকান দেখা যায় না। কিন্তু সমগ্র ভারতের পান প্রধানত পশ্চিম-বঙ্গেই জন্মে থাকে।

সবজি: সবজিচাষ ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নানা জাতীয় সবজির মধ্যে পটল, ঢেঁড়শ, লাউ, কুমড়ো, কচু, কলা, পেঁপে, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলো, সিম, মটরশুঁটি, পেঁয়াজ, টম্যাটো, শালগম, গাজর, বীট ইত্যাদির নাম করা যায়। ভারতের সর্বত্র কোন না কোন প্রকার সবজি জন্মায়।

তন্তুফসল

তুলো: তুলো উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে চতুর্থ। এদেশের প্রায় ৭৬ লক্ষ হেক্টর (১ হেক্টর = ২·৪৭ একর) জমিতে তুলোর চাষ হয়। তার মধ্যে দক্ষিণ-ভারতের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলই প্রধান। এছাড়া পূর্ব-পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু-

তেও যথেষ্ট তুলো জন্মায় (মানচিত্র ২)। তুলোর জন্য অন্তত ১০০সে বৃষ্টিপাত ও প্রখর উত্তাপ প্রয়োজন। অনুকূল মৃত্তিকায় বৃষ্টিপাত কম হলে জলসেচ দ্বারা তুলো উৎপাদন সম্ভব। মাঝারি আঁশ ও দীর্ঘ আঁশ, প্রধানত এই দুই জাতীয় তুলো ভারতে জন্মায়। দক্ষিণ ভারতে হ্রস্ব আঁশ ($\frac{৩}{৪}$–$\frac{৭}{৮}$ ইঞ্চি) ও পাঞ্জাবে দীর্ঘ আঁশ (১$\frac{১}{৮}$ ইঞ্চির অধিক) তুলোর ফলন উল্লেখ্য।

পাট: পাট উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয়। উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু পাটচাষের অনুকূল। এর জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। পশ্চিমবঙ্গ, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা,



পশ্চিমবঙ্গে পাটের ফসল

উত্তরবিহার ও ওড়িশায় প্রধানত পাট জন্মায় (মানচিত্র ২)। এছাড়া উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলেও কিছু পাট জন্মায়। বিদেশী মুদ্রা অর্জনে ভারতে পাট মূল্যবান বাণিজ্যিক ফসল।

রেশম: প্রাচীনকাল থেকে ভারত রেশম উৎপাদনে প্রসিদ্ধ। বারাণসী, মুশিদাবাদ, কাঞ্চীপুরম, বাঙ্গালোর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান উৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। তুঁতরেশম, এণ্ডি, মুগা, তসর প্রভৃতি নানা জাতীয় রেশম ভারতে উৎপন্ন হয়।

মহীশূর, জম্মু-কাশ্মীর ও পশ্চিমবঙ্গ প্রায় ৯৮ শতাংশ তুঁত রেশম উৎপাদন করে। ভারতের পাঁচটি অঞ্চলে প্রধানত নানা জাতীয় রেশম উৎপাদিত হয়:

(১) দক্ষিণ মহীশূর ও কোয়াম্বাটুর (তামিলনাড়ু) জেলা।

(২) পশ্চিমবঙ্গের মুশিদাবাদ, বাঁকুড়া, মালদহ ও বীরভূম জেলা।

(৩) কাশ্মীর ও জম্মু এবং পাঞ্জাবের সন্নিহিত অঞ্চল।

(৪) ছোটনাগপুর, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের তসর উৎপাদন অঞ্চল।

(৫) আসামের এণ্ডি ও মুগা অঞ্চল।

পশম: তন্তুফসল হিসাবে রেশমের চেয়ে পশম মূল্যবান। ভারতের পশম খুব উন্নত শ্রেণীর নয়। তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ ভারত অপেক্ষা উত্তর ভারতের পশম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। কাশ্মীর, হিমালয় অঞ্চল, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাডু ও মহীশূরে অধিকাংশ পশম উৎপন্ন হয়।

বাগিচা-ফসল

চা: চা-উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান প্রথম এবং বাগিচা-ফসলের মধ্যে চা সর্বপ্রধান। পাটের মত চাও প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে। এর জন্য সুপ্রচুর বৃষ্টিপাত ও সূর্যকিরণ প্রয়োজন হয়। কিন্তু বৃষ্টির জল চা-গাছের গোড়ায় জমে থাকলে তা ক্ষতিকর হয় বলে পর্বতঢালে ও প্রবেশ্য দো-আঁশ মৃত্তিকায় চা-এর চাষ হয়। দক্ষিণ ভারতে ২১৩৫ মিটারের উর্ধ্বে ও দার্জিলিং হিমালয়ে ২১৩৪ মিটারের নিচে চায়ের চাষ হয়। কিন্তু বড় বড় চা-বাগিচাগুলি পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরভাগে, ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকা, ত্রিপুরা, নীলগিরি, কেরালা ও হিমাচল প্রদেশে চায়ের চাষ হয়। দার্জিলিঙের চা স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। তামিলনাডুতে একর প্রতি চায়ের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি ও হিমাচল প্রদেশে সবচেয়ে কম। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদনের হার যথেষ্ট উঁচু (একর প্রতি যথাক্রমে ৯৫৫ ও ৯৫০ পাউণ্ড)। ত্রিপুরা এবং রাঁচীতেও বর্তমানে কিছু চায়ের চাষ হয় (মানচিত্র ২)।

কফি: উনবিংশ (১৮২৬-৩০ খ্রীঃ) শতাব্দীতে ইংরেজদের পরিচালনায় প্রথম কফি চাষ শুরু হলেও, সর্বপ্রথম জনৈক মুসলমান সন্ত মক্কা থেকে আনীত কফিচারা মহীশূরের বাবাবুদান পাহাড়ে রোপণ করেন। ১৫° অক্ষাংশের নিকটবর্তী কুর্গ, মহীশূর ও তামিলনাডুতে পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্ব ঢালে কফির সমধিক চাষ হয়। মহীশূরের কাদুর, সিমোগা ও হাসান জেলা এবং তামিলনাডুর নীলগিরি, পালনি ও সেভারয় পাহাড় অঞ্চলে প্রধানত কফির উৎপাদন হয়ে থাকে (মানচিত্র ২)। ১৯৬৯-৭০ সালে ভারতে ৭১,০০০ মেট্রিক টন কফি উৎপন্ন হয়। ভবিষ্যতে এই উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশা করা যায়। কফি বিদেশী মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিতে পারে।

সিঙ্কোনা: ভারতে সামান্য পরিমাণ সিঙ্কোনা জন্মালেও এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। প্রধানত উত্তর ভারতে দার্জিলিং জেলায় এর উৎপাদন হয়ে থাকে।

রবার : বর্তমান শতাব্দীর ১৯০২ সালে কেরালার পেরিয়ার নদীতীরে প্রথম রবার চাষ শুরু হয়। অধুনাকালে মহীশূর ও তামিলনাড়ুতেও রবার চাষ করা হচ্ছে। প্রায় ৪·২ লক্ষ একর জমিতে এর চাষ হয়। এর চাষের জন্য যথেষ্ট উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। এই কারণে এখন পর্যন্ত অন্যত্র রবার চাষ প্রসারিত হয় নি (মানচিত্র ২)।

পশুপালন

পশুপালন ভারতের কৃষিকার্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। নিকৃষ্ট শ্রেণীর হলেও এদেশের গবাদি পশুর সংখ্যা পৃথিবীতে সর্বাধিক। ১৯৭১-৭২ সালে এই জাতীয় পশুর সংখ্যা ছিল ২২৬৮ লক্ষ। এছাড়া ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, শুয়োর, গাধা ও উটের মিলিত সংখ্যা ছিল ১০৯৭ লক্ষ। এই বিপুল সংখ্যক পশু কৃষিকার্যে, ভারবহনে, সারসরবরাহে, খাদ্যোৎপাদনে ও তন্তু চর্ম ইত্যাদি বাণিজ্যিক সম্পদ সংস্থানে চাষী সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এছাড়া বহু সংখ্যক হাঁস-মুরগী কৃষিজীবীদের অমূল্য সম্পদ।

স্বাধীনোত্তর যুগের কৃষি উন্নয়ন

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবাসী কৃষিদক্ষ। বহুযুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা সত্ত্বেও ভারতের কৃষিব্যবস্থা সমস্যাজর্জর। নানাবিধ সমস্যার মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন কৃষিভূমি, বিক্ষিপ্ত জমিসত্ব, ভূমিক্ষয়, নিম্নমান উৎপাদন, সেচাভাব, সারাভাব, উৎকৃষ্ট বীজাভাব ও সর্বোপরি কৃষিপরিবারের অর্থাভাব উল্লেখযোগ্য। নানাবিধ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনোত্তর কালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বহুমুখী কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

পাশ্চাত্য জগতের তুলনায় কৃষিমান পশ্চাৎপদ হলেও পরিকল্পনাকালে কতগুলি বিষয় ভারতে স্পষ্ট ছিল; যথা,—কৃষিযোগ্য ভূমির সম্প্রসারণের সম্ভাবনা ও কৃষি-ফসলের আমূল পরিবর্তনের অসম্ভাব্যতা। তৎকালীন কৃষি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৫১ সালে প্রথম পরিকল্পনার শুরু। এই পরিকল্পনায় যেসব সূচী গ্রহণ করা হয় তা নিম্নরূপ :

(ক) খাদ্যফসল উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন ও তুলো, পাট ইত্যাদি শিল্পফসলের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা ক্রম-দূরীকরণ।

(খ) কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও সর্বমুখী গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যবস্থা অবলম্বন।

(গ) এইসব সূচী একমাত্র রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে এবং বেসরকারী কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ এতে কার্যকর হবে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিসূচীতে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়; যেমন :

(ক) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য যথেষ্ট খাদ্যোৎপাদন ; শিল্পসমূহের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ; রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্ত কাঁচামালের উৎপাদন ও দশ বৎসরের মধ্যে খাদ্য-ফসল, তৈলবীজ, তুলো, আখ, বাগিচা ও অন্যান্য ফসল এবং পশুসম্পদের দ্বিগুণ বৃদ্ধিকরণ।

(খ) কৃষিব্যবস্থায় বহুমুখী উৎপাদন চালু করা ; যেমন,—সুপারি, নারকোল, লাক্ষা, গোলমরিচ, কাজুবাদাম ইত্যাদির ফলন বৃদ্ধি।

(গ) কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি ও নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শস্য, যেমন ধান, গম ও ভুট্টা ইত্যাদির নির্বাচনমূলক উৎপাদন।

মোটামুটিভাবে (১) জমিব্যবহারের (Land use) সুষ্ঠু বিন্যাস, (২) উৎপাদনসীমা নির্ধারণ, (৩) পর্যাপ্ত সার সরবরাহ, (৪) সমীচীন মূল্যতালিকা প্রণয়ন ইত্যাদির দ্বারা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে সার্থক করার প্রস্তাব নেওয়া হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় উপলব্ধি করা হয় যে আর্থিক কারণে কোন কৃষিসূচী ব্যাহত হওয়া উচিত নয়। এই কারণে কৃষি-উন্নয়নের প্রশাসনিক দিকগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় ; যেমন,—কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ও সেচব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ভূমিসংস্কার বা পতিত জমি উদ্ধার, সেচব্যবস্থার বিস্তার, উন্নত-বীজের সাহায্যে কৃষিবিস্তার, জৈব ও রাসায়নিক সারের অধিকতর ব্যবহার ও সরবরাহ এবং সর্বোপরি ১০০০ লক্ষ টন খাদ্যফসল উৎপাদনের সঙ্কল্প নেওয়া হয়। এছাড়া উন্নত কৃষিসরঞ্জাম ব্যবহার, প্রশাসন, বন্টনব্যবস্থার উন্নয়ন ও কৃষিগবেষণা বিস্তারের কর্মসূচীও এই পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ উৎপাদন ও অন্যান্য সমস্যা দূরীকরণের পরিকল্পনা প্রাধান্য লাভ করে। কৃষি-উৎপাদন প্রতি বৎসর যাতে অন্তত ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় সেই লক্ষ্য রেখে চিন্তা করা হয়। এই বর্ধিত উৎপাদনের জন্য সেচবিস্তার, অধিক সার সরবরাহ, উৎপাদনের হার বৃদ্ধির জন্য নতুনতর বীজের সংস্থান, নিবিড় শস্য রোপণ, প্রধান প্রধান শস্যের জন্য সম্মিলিত গবেষণা ও বিক্রয়ব্যবস্থার উন্নতিসাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হবে, স্থির হয়। সেচব্যবস্থায় নলকূপের জন্য গ্রাম বৈদ্যুতিকীকরণ পরিকল্পনা ও কো-অপারেটিভ সংস্থার মাধ্যমে ঋণদানের ব্যবস্থা, পণ্যবিক্রয় ও বাণিজ্যের জন্য উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থা এবং গুদাম বা ভাণ্ডারের কথাও চতুর্থ পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়।

পশুপালন, দুগ্ধশিল্প, মৎস্যচাষ, বনপালন প্রভৃতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কৃষি-উন্নয়নে বিশেষ স্থান অধিকার করে। বড় বড় নগর উপকন্ঠে গ্রামাঞ্চলে ও ক্ষুদ্র শহরাঞ্চলে দুগ্ধ কেন্দ্র স্থাপন ; মৎস্য-উৎপাদনবৃদ্ধি ও রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্ত মৎস্যের

চাষ, মৎস্যজীবীদের আর্থিক উন্নতিসাধন, বনজ সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার, গ্রামাঞ্চলে বনসম্প্রসারণ ইত্যাদি এই সব পরিকল্পনার বিশিষ্ট দিক।

পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনাকালীন কৃষি-উন্নয়নের চিত্র ভারতের অনুরূপ। ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে আমন ও বোরো ধানের কর্ষিত জমির পরিমাণ ও উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে সেচ-ব্যবস্থার প্রসার ও গভীর নলকূপের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামবৈদ্যুতিকীকরণের মাধ্যমে নলকূপ চালনা সহজতর হতে পেরেছে। নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে কৃষি-উন্নয়নের একটি চিত্র পাওয়া যায়।

	১৯৪৭-৪৮	১৯৭১-৭২
আমন ধান (জমির পরিমাণ '০০০ একর)	৮২৭০·২	৯৬০৬·০
আমন ধান (উৎপাদন '০০০ টন)	৩১২১·৭	৪৫৩৫·২
বোরো ধান (জমির পরিমাণ '০০০ একর)	২৫·৩	৭৫২·৫
বোরো ধান (উৎপাদন '০০০ টন)	৯·৪	৯১৯·২

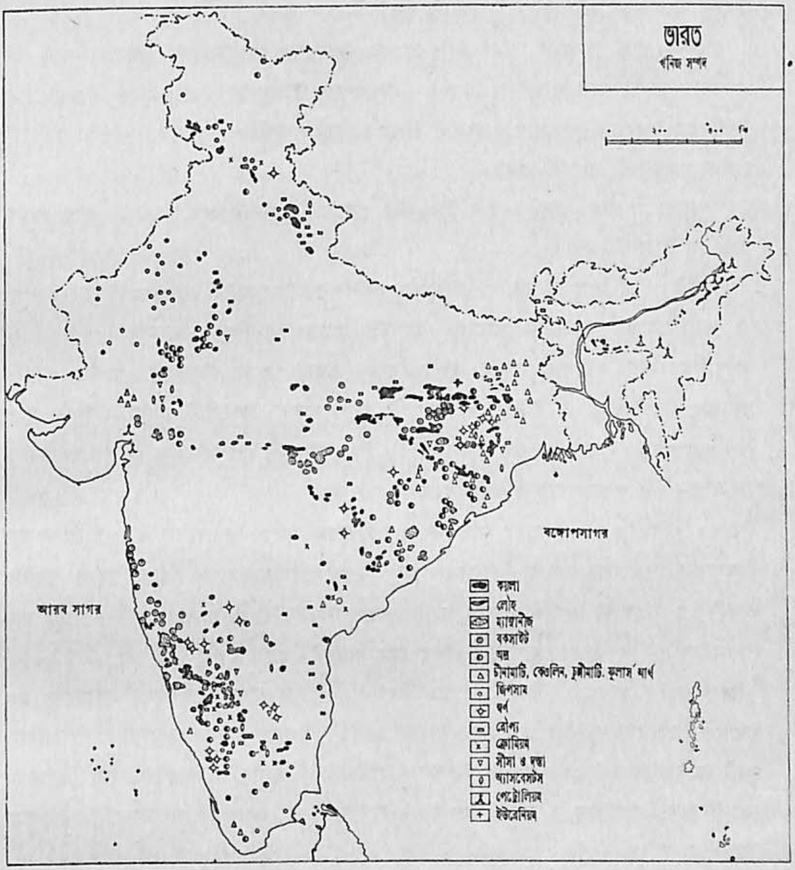
এছাড়া ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বছের ০·৬৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে ও শক্তিচালিত নলকূপ বছরে প্রায় ৫৯টি করে বৃদ্ধি পেয়েছে।

খনিজ ও শক্তি সম্পদ

ভারতে কয়লার মত প্রয়োজনীয় সম্পদ পর্যাপ্ত না হলেও ভারী ধাতুসম্পদে এদেশ সমৃদ্ধ। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক ও সঙ্কর ধাতুতে ভারত সৌভাগ্যশালী। এছাড়া চুনাপাথর, ডলোমাইট, চুল্লীমাটি প্রভৃতি এদেশের অন্যান্য পর্যাপ্ত সম্পদ। ভারতের অভ্রসম্পদ, বক্সাইট ও পারমাণবিক ধাতুসম্পদও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু লৌহ-বিযুক্ত ধাতুসম্পদে ভারত দরিদ্র। এদের মধ্যে তাম্রের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয় (মানচিত্র ৩)।

লৌহ: ভারতের লৌহ আকরিকে ৬০ শতাংশের অধিক লৌহকণা বর্তমান ও এতে ফস্‌ফরাসের ভাগ কম। বিহারের সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝড়, বোনাই, বাদাম-পাহাড়, বাবাবুদান ও সুলাইপাতে লৌহের সন্ধান মেলে। কোন কোন স্থানে প্রায় ভূপৃষ্ঠেই লৌহ উৎপাদন হয়। মধ্য ও উচ্চমানের লৌহ ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই বর্তমান। তবে বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, তামিলনাডু ও গোয়াতেই লৌহ-উৎপাদন সীমাবদ্ধ (মানচিত্র ৩)। এসব অঞ্চলের লৌহ উৎকৃষ্ট হেমাটাইট ও ম্যাগনেটাইট শ্রেণীর। মধ্যমানের লৌহ কঙ্কন, কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়।

ভারতের লৌহ-উৎপাদন বছরে ৮০ লক্ষ টনের মত। উচ্চমান লৌহ আকরিকের পরিমাণ ভারতে ৮,০০০০ লক্ষ টন ও মধ্যমান আকরিক ২২,০০০০ লক্ষ টন।



মানচিত্র ৩

ম্যাঙ্গানীজ: উনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারত ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদন ও রপ্তানীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বিশ্বে ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। উচ্চাঙ্গ শ্রেণীর ম্যাঙ্গানীজ ওড়িশা, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, রাজস্থান, গোয়া প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। ম্যাঙ্গানীজ রূপান্তরিত শিলার সহ-সম্পদ। মহারাষ্ট্রের বরোদা থেকে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল, বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় ম্যাঙ্গানীজ বলয় অবস্থিত। অনুমান করা হয় ১৮৫০ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ সম্পদ ভারতে বর্তমান।

অন্যান্য সংকর ধাতুর মধ্যে ক্রোমিয়াম উল্লেখযোগ্য। ওড়িশার কেওনঝড়ে

সর্বাধিক ক্রোমিয়াম উৎপন্ন হয়। এছাড়া বিহারের সিংভূম, মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা ও মহীশূরের হাসানে অবশিষ্ট ক্রোমিয়ামের সন্ধান মেলে। উৎপন্ন ক্রোমিয়ামের একটি বড় অংশ জাপান ও ইউরোপে রপ্তানী করা হয়।

সংকর ধাতু হিসাবে সীসা এবং দস্তার উৎপাদন অর্থনৈতিক পর্যায়ে পড়ে না। একমাত্র রাজস্থানের জাওয়ার অঞ্চলে এই সম্পদ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাওয়া যায়। বিহারের টুণ্ডুতে কিছু সীসার সন্ধান মেলে। তবে অধিকাংশ সীসা ও দস্তা বহির্দেশ থেকে আমদানী করতে হয়।

অন্যান্য সংকর ধাতু, যেমন টাংস্টেন, কোবাল্ট ও নিকেল, ভারতে প্রায় পাওয়া যায় না (মানচিত্র ৩)।

বক্সাইট: পশ্চিম বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক, মহারাষ্ট্রের কোলাপুর ও তামিলনাডুর সেভারয় পাহাড়ে বক্সাইট সম্পদ অবস্থিত (মানচিত্র ৩)। এই সম্পদের মোট পরিমাণ ২৭০০ লক্ষ টন। এখান থেকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বক্সাইট জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপে রপ্তানী করা হয়। বক্সাইটে অ্যালুমিনিয়াম কণা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যমান। কিন্তু কাশ্মীরের রিয়াসি ও পুঞ্চের অ্যালুমিনিয়মে ৮০ শতাংশ অ্যালুমিনিয়াম কণা বর্তমান।

অভ্র: বিশ্বের ৯০ শতাংশ অভ্র ভারতে উৎপন্ন হয়। এদেশের প্রায় অর্ধেক অভ্র বিহারের অভ্রবলয় থেকে আসে। এই বলয় ছোটনাগপুরের হাজারিবাগ অঞ্চলে অবস্থিত। এছাড়া অন্ধ্রের নেল্লোরে ও রাজস্থানের ভীলওয়ারাতেও অভ্র পাওয়া যায় (মানচিত্র ৩)। ভারতের অভ্র প্রধানত মাস্কোভাইট শ্রেণীর।

জিপসাম: সার ও সিমেন্ট শিল্পে জিপসামের ব্যবহার উল্লেখ্য। ভারতের ৯০ শতাংশ জিপসাম পশ্চিম রাজস্থানে পাওয়া যায়। এছাড়া জম্মু, গাড়োয়াল, তিরুচিরাপল্লী ও কোয়েম্বাটুরে অবশিষ্ট জিপসাম বর্তমান। জম্মু ও গাড়োয়ালের জিপসাম প্লাস্টার অব প্যারিস ও রঙ শিল্পে ব্যবহার হয়। জিপসাম উৎপাদনে ভারত স্বয়ম্ভর (মানচিত্র ৩)।

চীনামাটি, কেওলিন, চুল্লীমাটি, ফুলার্স আর্থ: চীনামাটি রাজমহল পাহাড়, সিংভূম, মহীশুর, দিল্লী ও জব্বলপুরে পাওয়া যায়। কেওলিন বা বিশুদ্ধ চীনামাটি রাজমহল পাহাড়, ভাগলপুর ও গয়ায় বর্তমান।

চুল্লীমাটি রাজমহল পাহাড়, সল্টরেঞ্জ, কোলার এবং বরাকরে পাওয়া যায়। চুল্লীমাটির প্রচণ্ড তাপধারণের ক্ষমতার জন্য কলকারখানার চুল্লীনির্মাণে ব্যবহার হয়ে থাকে।

ফুলার্স আর্থ জব্বলপুরের কাট্নি, পশ্চিম রাজস্থান ও মহীশূরে উৎপাদিত হয়। নানা প্রকার মৃৎশিল্প ও পরিশোধন শিল্পে এই খনিজ সম্পদের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। (মানচিত্র ৩)।

নির্মাণযোগ্য খনিজ সম্পদ : গ্রানাইট, চুনাপাথর, মার্বেল, বেলেপাথর, কোয়ার্টজাইট, ল্যাটারাইট, স্লেট ও ব্যাসাল্ট এই শ্রেণীর সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া চুন ও সাধারণ বালিকেও এই জাতীয় সম্পদ বলা যায়। এদের মধ্যে চুনাপাথর-এর লৌহ ইস্পাত শিল্প ও সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

নানাজাতীয় বালির মধ্যে কাচবালির কাচশিল্পে ব্যবহার উল্লেখ্য।

মূল্যবান ধাতু ভারতে পর্যাপ্ত নয়। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সোনা একমাত্র মহীশূরের কোলারে উত্তোলিত হয়। কিন্তু বালি-সোনা ভারতের বহু স্থানে বর্তমান। সুবর্ণরেখা নদীর পলিতে এই ধাতু বর্তমান বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু এই বালিসোনার অর্থনৈতিক মূল্য কম।

ভারতে রূপোর ব্যবহার বিশ্বে সর্বাধিক হলেও একমাত্র কোলারের স্বর্ণ আকরিকে যে রূপো পাওয়া যায় তার বাইরে আর কোন স্থানে এই ধাতুর সন্ধান মেলে না। তাম্র, সীসা, দস্তা ইত্যাদি ধাতুর বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে।

অ্যাস্‌বেস্‌টস : অ্যাস্‌বেস্‌টস্ ভারতের বহুস্থানে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কুদাপ্পা, মহীশূরের হাসান ও সিংভূমের সেরাইকেল্লা উল্লেখযোগ্য (মানচিত্র ৩)।

পারমাণবিক খনিজ সম্পদ : এই জাতীয় খনিজ সম্পদে ভারত সৌভাগ্যশালী। সিংভূম ও রাজস্থানের ইউরেনিয়ম ধাতু পারমাণবিক শক্তির উল্লেখ্য কাঁচামাল। তবে দক্ষিণ ভারতের মোনাজাইট বালি পারমাণবিক শক্তির অমূল্য সম্পদ। মোনাজাইট বালি থেকে থোরিয়ম সংগৃহীত হয়। এই থোরিয়ম বিহারের গেলসার বালিতে আরও বেশি পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু জারকন কৃষ্ণ বালি থেকে এই সম্পদ অধিক পরিমাণে পাওয়া সম্ভব। ভারতে কৃষ্ণবালির পরিমাণ বিশ্বে সর্বাধিক।

শক্তি সম্পদ : যে কোন দেশের শিল্পবিস্তারে শক্তি সম্পদের জোগান অপরিহার্য। তাপশক্তি বা বিদ্যুৎশক্তি ভিন্ন কোন শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। শক্তি উৎপাদনে ভারত খব অগ্রগামী নয়। এদেশে জনপ্রতি বাৎসরিক শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ ১০০ কিলোওয়াটের কম। এশিয়া মহাদেশে জাপান, ইস্রায়েল, তাইওয়ান (চীন) এর জনপ্রতি শক্তিব্যবহার ভারতের চেয়ে অনেক বেশি।

ভারতের শক্তি সম্পদের মধ্যে কয়লা, খনিজ তৈল, জলশক্তি, স্বাভাবিক গ্যাস ও পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তাপশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে কয়লার অবদান অনস্বীকার্য। শক্তি সম্পদের মধ্যে কয়লা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান খনিজ সম্পদ। এই সম্পদ স্তরীভূত শিলাবিশেষ। প্রাগৈতিহাসিক কালের অরণ্য বা বৃক্ষাবশেষ হ্রদ, উপহ্রদ, জলাভূমি বা সমুদ্রবক্ষে সঞ্চিত হয়ে অন্যান্য স্তরীভূত শিলার সঙ্গে চাপ ও তাপের ফলে কয়লা সম্পদে

রূপান্তরিত হয়। এই কারণে সাধারণত বেলেপাথর, কাদাপাথর (সেল) ইত্যাদির সঙ্গে কয়লার সহ-অবস্থান লক্ষণীয়।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী ভারতের গণ্ডোয়ানা এবং টারসিয়ারি কয়লার পরিমাণ নিম্নরূপ:

(ক) প্রমাণিত পরিমাণ—৪২,৬৪৯০ লক্ষ টন।

(খ) অনুমিত পরিমাণ—৭৯,৩৯২০ লক্ষ টন।

উভয় প্রকার কয়লার স্তর কোথায়ও ৪ ফীটের কম নয়। ভারতে গণ্ডোয়ানা শ্রেণীর কয়লা নিঃসন্দেহে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে দামোদর অঞ্চলই সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানকার কয়লার স্তর বহু স্থানে ৮০ ফীটের অধিক প্রশস্ত। ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বর্ধমান অঞ্চলে ভারতের ৬০ শতাংশ কয়লা উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার ছাড়া মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার নানা স্থানে কয়লা সম্পদ বর্তমান। এছাড়া হিমাচলপ্রদেশে, আসামের গারো পাহাড়, কাশ্মীর, রাজস্থান, তামিলনাডু ও কেরালায় অপ্রধান শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়।

ভারতের গণ্ডোয়ানা কয়লা উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস শ্রেণীর। টারসিয়ারি কয়লা ভাঁজ পর্বতে অবস্থিত হওয়ায় তা ভঙ্গুর অবস্থায় বিদ্যমান। গণ্ডোয়ানা কয়লা অপেক্ষা এই কয়লা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। লিগনাইট কয়লা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মানের। কাশ্মীরের বারমূলা, রাজস্থানের বিকানীর, তামিলনাডুর নৈইভেলী, কেরালার কান্নানোর ও কাসারগোড, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি (বক্সাপাহাড়) অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য লিগনাইট পাওয়া যায়।

এদেশের প্রধান প্রধান কয়লা উৎপাদন অঞ্চলগুলি নিম্নরূপ:

১। রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, গিরিডি, বোকারো ও করণপুরা অঞ্চল।
২। ওয়ার্ধা-গোদাবরী অঞ্চল।
৩। শোন উপত্যকা হুটার-উমারিয়া ও সোহাগপুর অঞ্চল।
৪। ছত্রিশগড় ও মহানদী অঞ্চল (তালচির শ্রেণী)।
৫। সাতপুরা অঞ্চল (মোহপানি—কান্নান ও পেঞ্চ)।
৬। গিরিডি, জয়ন্তী ও রাজমহল পাহাড় অঞ্চল।
৭। দার্জিলিং পর্বতের সানুদেশ।

কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ: তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অর্থনৈতিক কারণে কয়লাখনি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ভোগকেন্দ্রে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কয়লা পরিবহনের জন্য ব্যয়বহুল হয়ে গড়ে। ভারতের তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন অঞ্চলগুলিকে নিম্নরূপে ভাগ করা হয়।

অঞ্চল	উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ কিলোওয়াট) ১৯৬৬-৬৭
উত্তরাঞ্চল	২১,৭৬০
পশ্চিমাঞ্চল	৬৩,৪০০
দক্ষিণাঞ্চল	২৬,০৪০
পূর্বাঞ্চল	৮০,২২০
উত্তরপূর্বাঞ্চল	—
সমগ্র ভারত	১৯১,৪২০

তামিলনাড়ুর নেইভেলি ও এন্নোর, অন্ধ্রের কোথাগুডেম; বিহারের বারাউনি, পাথরাতু ও বোকারো; উত্তরপ্রদেশের হারদুয়াগঞ্জ ও ওব্রা; দিল্লীর বদরপুর; গুজরাটের ধুবারান; মধ্যপ্রদেশের সাতপুরা ও কোরবা; মহারাষ্ট্রের নাগপুর ও ট্রম্বে; ওড়িশার তালচির; ও পশ্চিমবঙ্গের ব্যাণ্ডেল, দুর্গাপুর ও সাঁওতালডি প্রভৃতি কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

খনিজ তৈল বা পেট্রোলিয়ম: পেট্রোলিয়ম বা শিলাতৈল সমুদ্রবক্ষে সৃষ্ট স্তরীভূত শিলার অঙ্গবিশেষ। বেলেপাথর, কাদাপাথর ও চুনাপাথরের সঙ্গে পেট্রোলিয়মের সহ-অবস্থান উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন উদ্ভিদ ও জীব দেহাবশেষের তৈলাক্ত পদার্থ থেকে পেট্রোলিয়মের উৎপত্তি। স্তরীভূত বা পাললিক শিলার ঊর্ধ্বভঙ্গে (anticline), স্তরভঙ্গে (fault) ও স্তরফাঁকে (stratigraphic trap) পেট্রোলিয়ম সঞ্চিত থাকে।

ভারতে অনুমিত ও প্রমাণিত পেট্রোলিয়মের পরিমাণ ১৫৫০ লক্ষ টন। এদেশে প্রথম পেট্রোলিয়ম উৎপন্ন হয় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯১৫ সাল পর্যন্ত উৎপাদনের হার ছিল সামান্য। বর্তমানকালেও ভারত পেট্রোলিয়ম উৎপাদনে বিশ্বের বাজারে বহু পশ্চাৎবর্তী। ১৯৭১ সালে অপরিশোধিত তৈলের পরিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন (সমগ্র বিশ্বে ১৬,১০০ লক্ষ মেট্রিক টন)।

ভারতের প্রধান প্রধান তৈলক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ:

(১) আসাম: লখিমপুর জেলার (ক) ডিগবয়, (খ) নাহারকাটিয়া, (গ) মোরান, (ঘ) বাপ্পাপুং, (ঙ) হানসানপুর ও (চ) হাগিরজং।

(২) কাছাড় জেলার সুর্মা উপত্যকায় (ক) বদরপুর, (খ) মাসিমপুর, ও (গ) পাথারিয়া। ১৯৬১ সালে নুনমাটির নিকট রুদ্রসাগরে তৈলের সন্ধান পাওয়া গেছে।

(৩) গুজরাটের (ক) লুনেজ, (খ) আঙ্কেলসর ও (গ) কালোল (ব্রোচ জেলা)।

(৪) পাঞ্জাবের জ্বালামুখীতে ১৯৫৭ সালে পেট্রোলিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে (মানচিত্র ৩)।

আসাম অয়েল কোম্পানি, স্ট্যানভ্যাক, বার্মাশেল, ক্যালটেক্স, এসো (বর্তমানে হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়ম), ইণ্ডিয়ান রিফাইনারি, কোচিন রিফাইনারি, মাদ্রাজ রিফাইনারি লিমিটেড ইত্যাদি সংস্থা ভারতের পেট্রোলিয়ম শিল্পে নিযুক্ত। তৈল-পরিশোধন শিল্পের

প্রধান প্রধান উৎপাদন গ্যাসোলিন, কেরোসিন ও গ্যাসতৈল। এছাড়া নানাপ্রকার ব্যবহার্য পদার্থ পেট্রোলিয়ম পরিশোধন কেন্দ্রে উৎপন্ন হয়। শক্তিসম্পদ হিসাবে পেট্রোলিয়মের স্থান কয়লার অনেক পরে। যান চলাচল, আলোক উপকরণ ও শিল্পের কাঁচা মাল রূপে পেট্রোলিয়মের ব্যবহার উল্লেখ্য।

জলবিদ্যুৎ শক্তি: জলবিদ্যুৎ শক্তি সাধারণত খরস্রোতা নদী, বিপুলাকার নদীর জলপ্রবাহ ও জলপ্রপাত থেকে উৎপাদন করা হয়। কৃত্রিম জলাধার থেকেও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। শক্তিসম্পদ হিসাবে জলবিদ্যুতের স্থান একদিক থেকে কয়লা ও পেট্রোলিয়মের উর্ধ্বে—কারণ এই সম্পদ অক্ষয় ও চিরস্থায়ী সম্পদ।

ভারতের সুপ্ত বা সম্ভাব্য জলশক্তির পরিমাণ ৪১,০০০,০০০ কিলোওয়াট। এই বৃহৎ শক্তির মাত্র ৪০ শতাংশ শক্তি উৎপাদনে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভারতের সুপ্ত জলশক্তির চিত্র:

দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমবাহিনী নদী	৪৩·৫ লক্ষ কি
দক্ষিণ ভারতের পূর্ববাহিনী নদী	৮৬·৩ ,, ,,
মধ্য ভারতের নদী	৪২·৯ ,, ,,
গঙ্গা অববাহিকা	৪৮·৩ ,, ,,
সিন্ধু অববাহিকা	৬৫·৮ ,, ,,
ব্রহ্মপুত্র ও সন্নিহিত নদী অববাহিকা	১২৪·৯ ,, ,,
	৪১১·৭ ,, ,,

কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম প্রপাতে ১৯০২ সালে সর্বপ্রথম ভারতের জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। এর পরই বোম্বাই অঞ্চলে টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্টেশনের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে মহীশূর, কেরালা, পাঞ্জাব, ওড়িশা, জম্মু ও কাশ্মীরে প্রধান শক্তি জলবিদ্যুৎ শক্তি। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও আসামে অংশত জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন লক্ষণীয়। এইসব অঞ্চলে ও মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান উৎপন্ন শক্তি তাপ-বিদ্যুৎ শক্তি।

জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে মহীশূর একটি অগ্রগামী রাজ্য। শিবসমুদ্রমের শক্তি কোলার স্বর্ণখনি অঞ্চলের জন্য ও সরাবতী নদী উপত্যকার শক্তি ভদ্রাবতী লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্রের জন্য উৎপাদিত হয়ে থাকে। এছাড়া কাবেরী নদীর সিমসাপুরা, মহাত্মা গান্ধী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও যোগপ্রপাতের নিম্নে অদূরে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়।

মহারাষ্ট্রের ওয়ালাওয়ান, সিরভাডা, খপোলি (টাটা হাইড্রো পাওয়ার কোঃ লিমিটেড),

লোনাভ্লা, ভিবপুরী, ভীরা (নীলামুলা) হ্রদ ও কয়না প্রকল্প জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে।

তামিলনাডুর প্রধান প্রধান জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র পাইকারা, মেট্টুর (কাবেরী নদী), মোয়ার ও পাপনাশম (তাম্রপর্ণী নদী)। কেরালার প্রধান প্রধান কেন্দ্র পাল্লাভাসাল, ইড্ডিকি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (পেরিয়ার নদী) ইত্যাদি। অন্যান্য জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে অন্ধ্র প্রদেশের নাগার্জুন সাগর প্রকল্প (কৃষ্ণা নদী), মাচকুঁদ প্রকল্প (অন্ধ্র-ওড়িশা সীমান্তে), শ্রীশৈলম প্রকল্প (কৃষ্ণা নদী—নাগার্জুন সাগরের উর্ধ্বে); উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম-ভাগে উচ্চ-গঙ্গার কতগুলি ক্ষুদ্র প্রপাত, রিহান্দ বাঁধ প্রকল্প, যমুনা জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা, পাঞ্জাব হিমাচল প্রদেশের ভাক্‌রা প্রকল্প ও যোগীন্দর নগর (উল নদী), জম্মু ও কাশ্মীরের বুনিয়ার (ঝিলম নদী), পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও মেঘালয়ের শিলং-এর নাম করা যায়।

পারমাণবিক শক্তি : পারমাণবিক শক্তির প্রধান উৎস ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম। কেরালা ও তামিলনাডুর উপকূলে মোনাজাইট বালুতে অপরিমিত থোরিয়ম বর্তমান। পৃথিবীতে এখানেই সর্বাধিক থোরিয়মের সন্ধান পাওয়া যায়। এই কারণে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ ভারতে বিদ্যমান বললে অত্যুক্তি হয় না। এক টন ইউরেনিয়ম থেকে যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হতে পারে তা ১০,০০০ থেকে ১১,০০০ টন কয়লার বিদ্যুৎ শক্তির সমান। এই কারণে পারমাণবিক শক্তির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। কিন্তু উৎপাদনে ব্যয়বহুলতার জন্য পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন ভারতে অপ্রধান। বর্তমানে মহারাষ্ট্রের তারাপুরে ও রাজস্থানের রাণাপ্রতাপ সাগরে (ইউরেনিয়মের সাহায্যে) এই শক্তি উৎপাদিত হয়। ভবিষ্যতে তামিলনাডুর কল্পক্কামে ও উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে এই শক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে।

শিল্প

বিশাল দেশ হিসাবে ভারতের শিল্পায়ন যথেষ্ট নয়। প্রাচীন কাল থেকে কৃষিসমৃদ্ধ দেশ হিসাবে এদেশের খ্যাতি সুবিদিত। শুধুমাত্র বয়ন, কারু ও নানা ক্ষুদ্র শিল্পে ভারতের প্রসিদ্ধি ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে রেলপথ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শিল্পবিপ্লব শুরু হয়। এর আগে কারখানা পর্যায়ের শিল্প নীল তৈরি ও জাহাজ মেরামতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৮৫০ থেকে ১৮৭৪ সালের মধ্যে যে শিল্পপ্রসার ঘটে তার মধ্যে ভারতীয় উদ্যোগে ১৮৫৪ সালে বোম্বাই অঞ্চলের কার্পাস বয়ন শিল্প, ১৮৫৫ সালে রিষড়ার (পশ্চিমবঙ্গ) পাটশিল্প ও ১৮৬৭ সালে বালির (কলকাতার কাছে) কাগজ শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ক্রমে কাচ, রাসায়নিক, লৌহ গালাই, চাল, ময়দা, পশম ও রেশম শিল্পের পত্তন ও প্রগতি লক্ষণীয়। এই পঁচিশ বছরে (১৮৫০-১৮৭৪) উল্লেখযোগ্য প্রগতি ঘটে পাটশিল্পের ক্ষেত্রে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৮৭৫ সালের পর) কয়লাশিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিল্প গঠন দ্রুততর হয়। ১৮৭৫ সালে কুলটিতে প্রথম বিদেশী উদ্যোগে লৌহপিণ্ড শিল্প গড়ে ওঠে। এছাড়া নানাস্থানে কাগজ শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ১৯০৭ সালে সাক্‌চীতে টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কম্পানি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠার পর ভারতের শিল্পজগতে নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী কালে বিভিন্ন স্থানে নানা শিল্পের পত্তন হয়। স্বাধীনোত্তর যুগে আরও লক্ষণীয়ভাবে শিল্প প্রসার ঘটে।

শিল্প বলতে আমরা কারখানাজাত দ্রব্য-সামগ্রীকে বুঝি। প্রকৃত অর্থে মানুষের প্রয়োজনে মৌলিক বস্তুকে যে কোন রূপদান করাই শিল্প। যেমন ধান থেকে চাল, গম থেকে আটা, কার্পাস থেকে বস্ত্র, কাঠ-বাঁশ থেকে কাগজ ও আসবাবপত্র, বালি-চুন ইত্যাদি থেকে কাচ, ধাতু থেকে ধাতুদ্রব্য, মাটি থেকে মৃৎবস্তু ইত্যাদি। আবার খনি থেকে খনিজ সম্পদ আহরণ, অরণ্য থেকে কাঠ আহরণও এক ধরনের শ্রমশিল্প। অর্থাৎ মানুষের ভোগ্যপণ্য উৎপাদন প্রথার আর এক নাম শিল্প।

ভারতের শিল্পসমূহকে নানা ভাগে ভাগ করা সম্ভব। যথা:

(১) বৃহদায়তন শিল্প।
(২) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প।

অথবা

(১) ভারী শিল্প।
(২) হালকা শিল্প।

অথবা

(১) ধাতব শিল্প।
(২) অধাতব শিল্প।

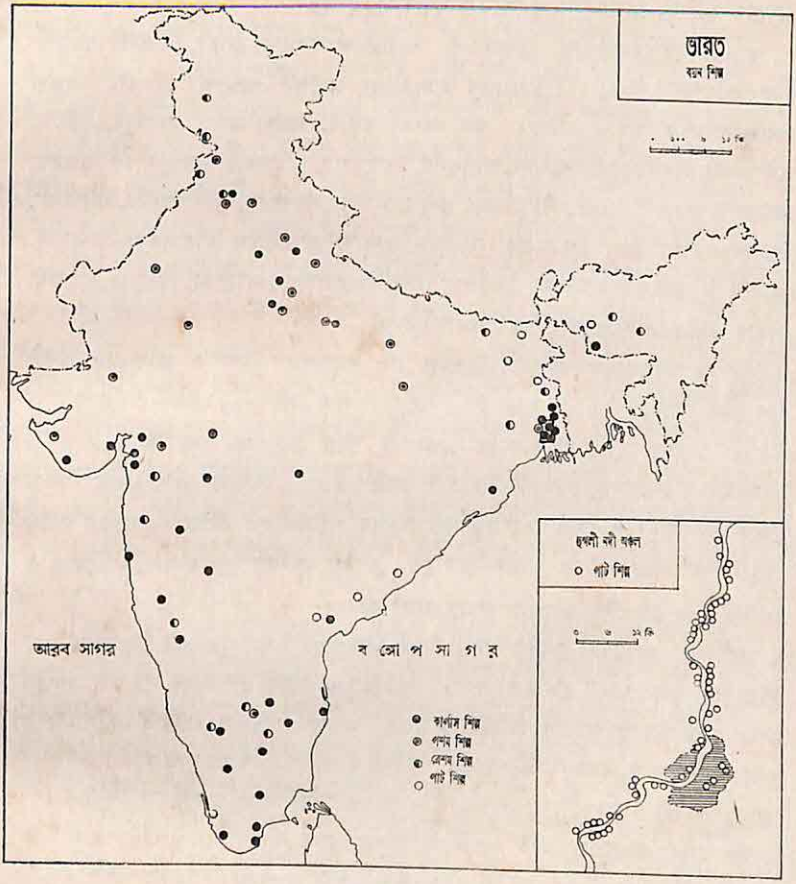
এ ছাড়াও শিল্পসমূহের আরও শ্রেণীবিন্যাস সম্ভব।

ভারতের বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে বয়নশিল্প, লৌহ-ইস্পাত শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, চিনি শিল্প ও চা-শিল্প উল্লেখযোগ্য।

বয়ন শিল্প

কার্পাস শিল্প: সভ্যতার আদিযুগ থেকে ভারতে কার্পাস শিল্প কুটির শিল্প পর্যায়ে বর্তমান ছিল। যন্ত্রযুগের পূর্বে ঢাকার (বর্তমান বাংলাদেশ) মসলিন, ওড়িশার পিপলি ও মসলিপটম, কালিকট ও বারহানপুরের উৎকৃষ্ট বস্ত্র সারা বিশ্বে সুপরিচিত ছিল। যন্ত্রযুগের অব্যবহিত পূর্বে ভারতে তাঁত শিল্পের অবনতি ঘটে ও ভারত প্রধানত কাঁচা কার্পাস রপ্তানীকারক দেশ হিসাবে পরিণত হয়। কার্পাস পশ্চিম ভারতের

উৎপন্ন দ্রব্য হওয়ায় বোম্বাই বন্দর থেকে তা বিদেশে চালান হত। ঐতিহাসিক কালেও বোম্বাই থেকে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যে কার্পাস রপ্তানী হবার নজির পাওয়া যায়। বোম্বাই অঞ্চলের কার্পাস উৎপাদন ও কার্পাস বাণিজ্যের এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে ১৮৫৪ সালে বোম্বাই অঞ্চলে কার্পাস শিল্পের পত্তন হয়। এরও পূর্বে ১৮১৮ সালে কলকাতার সন্নিকটে ফোর্ট গ্লস্টারে প্রথম কার্পাস শিল্প গড়ে ওঠে।



মানচিত্র ৪

কার্পাস শিল্পের প্রথম যুগে বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে তা কেন্দ্রীভূত হয় ও অন্যান্য স্থানে এই শিল্পের প্রসার ছিল নগন্য। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতে নানাস্থানে এই শিল্পের বিকেন্দ্রীভবন লক্ষণীয়।

এই শিল্প গঠনের প্রথম পর্যায়ে কাঁচামালের সান্নিধ্য, সদ্য প্রসারিত রেলপথের

মাধ্যমে ছোটনাগপুরের কয়লা আমদানী, জলপথে ডারবান থেকে কয়লা আনয়ন, স্থানীয় বয়নকার্যের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা, আর্দ্র জলবায়ু (সুতোকাটার অনুকূল), পার্শী ও ভাটিয়া বণিকদের সুপ্রচুর মূলধন, স্থানীয় ও বিদেশের বাজার ইত্যাদি সুযোগে বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে কার্পাস শিল্প গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে সারা ভারতের তাঁতশিল্পের অভিজ্ঞতা, কলবস্ত্রের চাহিদা, কার্পাস সরবরাহের সুবিধা ইত্যাদি কারণে ভারতে কার্পাসশিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ সহজ হয়।

বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চলের তামিলনাড়ু, বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চল, হুগলী শিল্পাঞ্চল (কলকাতার উপকন্ঠ), উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত, মহীশূর, পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি স্থানে কার্পাস শিল্প প্রসারিত। এর মধ্যে বোম্বাই, আমেদাবাদ, সোলাপুর, হাবলি, কোলাপুর, সুরাট, ব্রোচ, বরোদা, ভাবনগর, পোরবন্দর, রাজকোট, নাগপুর, কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই, সালেম, তিন্নেভেলী, মাদ্রাজ, গুন্টুর, মহীশূর, ত্রিবান্দ্রম, তুতিকোরীণ, পণ্ডিচেরী, কুইলন; বেলঘরিয়া, শ্যামনগর, সোদপুর, ঘুসুড়ি, শালকিয়া, শ্রীরামপুর, পানিহাটি, মৌরীগ্রাম, ফুলেশ্বর; কানপুর, আলিগড়, আগ্রা, মোরাদাবাদ, এটাওয়া, দিল্লী ও লুধিয়ানা প্রধান প্রধান কার্পাসশিল্প কেন্দ্র (মানচিত্র ৪)।

ভারতে তাঁতবস্ত্রের পরিমাণ এখনও ৪০ শতাংশ। মিল ও তাঁতবস্ত্রের মোট উৎপাদন পরিমাণ ১৯৬৮ সালে ছিল ৭৮,৯৬০ লক্ষ মিটার (১৯৫১—৪৭,৪০০ লক্ষ মি)। ১৯৭৩ সালে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৩,৫০০ লক্ষ মি। এ থেকে ক্রমবর্ধমান কার্পাসবস্ত্র উৎপাদনের চিত্র পাওয়া যায়। কার্পাসশিল্পের প্রধান সমস্যা যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও হস্তচালিত তাঁতকে শক্তিচালিত তাঁতে রূপান্তরিত করা। এই ব্যবস্থা ধীর পর্যায়ে এগিয়ে চলেছে। এছাড়া কার্পাস বস্ত্র নমুনায় নবীনতা ও বৈশিষ্ট্যদান এই শিল্পকে উন্নত করার অপর লক্ষ্য।

পাটশিল্প: পাটশিল্পে ভারত সমগ্র বিশ্বে অদ্বিতীয়। পাটকল প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই শিল্প তাঁতশিল্প রূপেই প্রবর্তিত ছিল। পাটশিল্পের ইতিহাসে প্রথম পাটকল ১৮৩৪ সালে স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে সর্বপ্রথম পাটকল ১৮৫৫ সালে কলকাতার কাছে রিষড়ায় গড়ে ওঠে। বর্তমানে পাটকলগুলি প্রধানত হুগলী নদীতীরে উত্তরে ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণে বিড়লাপুর পর্যন্ত ৬০ মাইল জুড়ে প্রসারিত (মানচিত্র ৪)। ১৯৭০ সালে ভারতের মোট ৯৫টি পাটকলের মধ্যে হুগলীতীরে ৮০টি, অন্ধ্রে ৪টি, বিহারে ৩টি, উত্তরপ্রদেশে ৩টি ও মধ্যপ্রদেশে একটি অবস্থিত।

পশ্চিমবঙ্গে এই কেন্দ্রীভবনের প্রধান কারণ কাঁচামালের (পাট) সান্নিধ্য, হুগলী নদীর নাব্যতা, কয়লা অঞ্চলের সান্নিধ্য (রাণীগঞ্জ ঝরিয়া), সর্বোপরি কলকাতা বন্দরের নিকটবর্তিতা। পাটকলের সংখ্যা ১৯৬২ সালের (১১৩টি) থেকে কমে গেলেও উৎপাদনের মাত্রা অনুরূপ হারে হ্রাস পায়নি। ১৯৬৮ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০·৯ লক্ষ টন; অপরপক্ষে ১৯৬২তে এই উৎপাদন ছিল ১২·৩ লক্ষ টন।

বিদেশী মুদ্রা অর্জনে পাটের মূল্য ভারতে যথেষ্ট। উৎপাদনের অধিকাংশ অর্থাৎ প্রায় ৭০ শতাংশ বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে (৬.৭ লক্ষ টন—১৯৬৮ সাল)। যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেনটিনা, ক্যানাডা, সোভিয়েত রাশিয়া, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ ও যুক্তরাজ্য পাটজাত দ্রব্য ক্রয় করে থাকে।

অন্যান্য বয়নশিল্পের মধ্যে পশম, রেশম ও রেয়নশিল্পের নাম করা যায়। ভারতে শীত নাতিদীর্ঘ হওয়ায় পশমবস্ত্রের চাহিদা তুলনামূলক ভাবে কম। হিমালয় ও রাজস্থানের মরু অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পশম উৎপন্ন হয়। অন্যান্য উষ্ণ অঞ্চলের পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর। হিমালয় অঞ্চল, বিকানীর, কচ্ছ-কাথিয়াবাড়, পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশ পশম উৎপাদনে উল্লেখ্য। বিদেশ থেকে মেরিনো, ব্যাসবুলেট, ও পোলওয়ার্থ মেষ আমদানী করে পশমের উন্নতি সাধনের চেষ্টা ভারতে চলেছে। পশমজাত দ্রব্যের মধ্যে কম্বল, কার্পেট, চাদর, কোট-স্যুটের কাপড় ও নানারকম পশম সুতো প্রভৃতির নাম করা যায়। ১৮৭৬ সালে কানপুরে ও ধারিয়ালে প্রথম পশম কল স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে বোম্বাই, বাঙ্গালোর, বরোদা, জামনগর ও অন্যান্য স্থানে এই শিল্পের প্রসার ঘটে। বর্তমানে পশম, তাঁত ও কল উভয়ের দ্বারাই প্রস্তুত হয়।

রেশম শিল্পে ভারতের প্রসিদ্ধি সুপ্রাচীন। উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষে ভারতের স্থান পৃথিবীতে অনেক উর্ধ্বে। বারাণসী, কাঞ্চীপুরম, মুর্শিদাবাদ, শ্রীনগর, বাঙ্গালোর, মহীশূর প্রভৃতি কেন্দ্র রেশমবস্ত্র উৎপাদনে প্রসিদ্ধ। এছাড়া মহীশূর, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, জম্মু ও কাশ্মীর ও তামিলনাড়ুর নানা স্থান নানাবিধ রেশম উৎপন্ন করে থাকে (মানচিত্র ৪)। বিভিন্ন প্রকার রেশমের মধ্যে তুঁতরেশম, মুগা, তসর ও এণ্ডির নাম করা যায়।

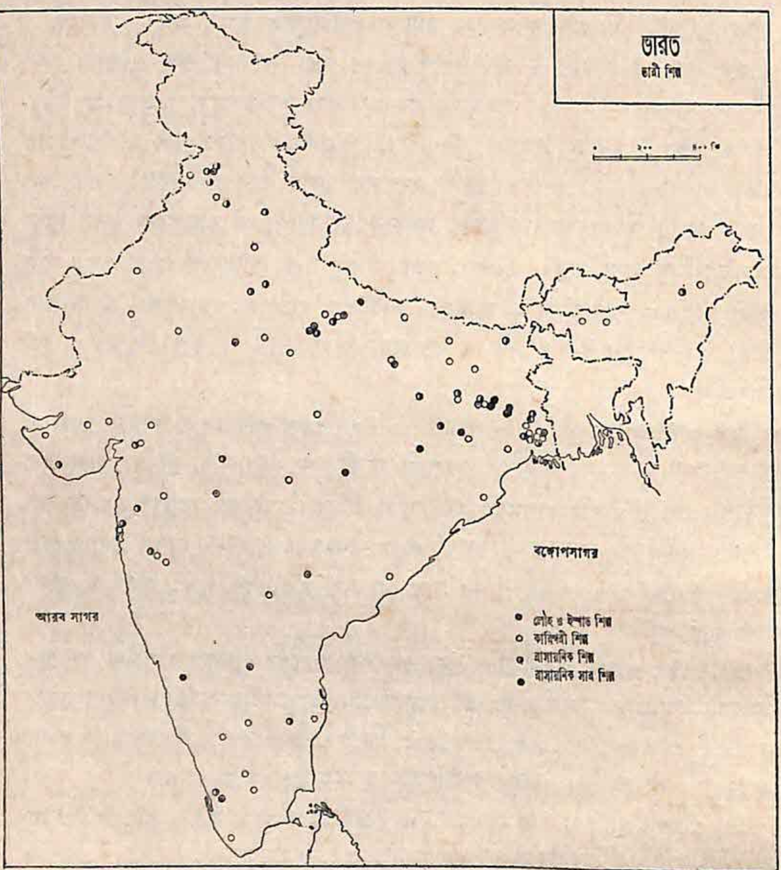
রেয়ন শিল্প ভারতে অধুনাগঠিত এবং এই শিল্প ভারতের বস্ত্রশিল্পের অনেক সমস্যার সমাধান করেছে। এখন পর্যন্ত এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠমণ্ড বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। তবে কেরালায় ও অন্যত্র বাঁশ থেকে এই কাঁচামাল উৎপাদন হচ্ছে বা চেষ্টা চলছে। রেয়নের উৎপাদন ভারতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প: যে কোন দেশের শিল্পপ্রগতির প্রধান বাহন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দে ঋগ্বেদে লোহাগালাইএর উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় ভারত ঐতিহাসিক যুগে কার্বন স্টীল তৈরি করত। দিল্লীর লৌহস্তম্ভ এই শিল্পকলার নিদর্শন।

আধুনিক পদ্ধতিতে লৌহশিল্পের সূচনা ১৮৭৪ সালে। ১৯০৭ সালে জামসেদপুরে টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে নতুন শিল্পযুগের শুরু হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাক্কালে যে সব লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র ছিল তা নিম্নরূপ।

(১) জামসেদপুর, (২) কুলটি-বার্নপুর ও (৩) ভদ্রাবতী (মানচিত্র ৫)।

জামসেদপুরে টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানির অবস্থানিক যে সব সুবিধা ছিল তা হল—ঝরিয়ার কয়লা, ওড়িশার গরুমহিষানীর ও বিহারের নোয়ামুন্ডির লোহা, ওড়িশার গাংপুরের চুনাপাথর, ডলোমাইট ও ম্যাঙ্গানীজ, কলকাতা বন্দরের সান্নিধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা।



মানচিত্র ৫

কুলটি বার্নপুর অঞ্চলে রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা, ওড়িশার লোহা, চুনাপাথর ও ম্যাঙ্গানীজ, পূর্ব রেলপথে অবস্থান ও কলিকাতার সান্নিধ্য হেতু এই শিল্প গড়ে ওঠে।

মহীশূরের ভদ্রাবতীর লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রধান ভিত্তি বাবাবুদান পাহাড়ের লৌহ

আকরিক, পশ্চিমঘাট অরণ্য থেকে প্রস্তুত কাঠ কয়লা, স্থানীয় চুনাপাথর, ও পরবর্তী কালে যোগ প্রপাতের জলবিদ্যুৎ প্রভৃতি।

উল্লিখিত শিল্পকেন্দ্রসমূহে প্রাক্-পরিকল্পনা যুগে প্রায় ৩০ লক্ষ টন লৌহ-ইস্পাত তৈরি হত।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেডের আওতায় রাউরকেল্লা, ভিলাই ও দুর্গাপরে তিনটি শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হয় (মানচিত্র ৫)।

দুর্গাপুর ও রাউরকেল্লার অবস্থানিক সুবিধা বহুলাংশে বরাকর, কুলটি ও জামসেদপুরের অনুরূপ।

ওড়িশার রাউরকেল্লার লৌহ-ইস্পাত শিল্প পশ্চিম জার্মানির সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা থেকে ২৫৭ মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে রাউরকেল্লা অবস্থিত। ওড়িশার বোনাই পাহাড়ের লৌহ, দামোদর উপত্যকার কয়লা, হিরাকুঁদের জলবিদ্যুৎ, স্থানীয় চুনাপাথর ও ডলোমাইট এই শিল্পের প্রধান সহায়ক।

দুর্গাপুরের লৌহ-ইস্পাত শিল্প যুক্তরাজ্যের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে। রাণীগঞ্জ-বরাকরের কয়লা, বিহারের গুয়া অঞ্চলের লৌহ, ওড়িশার চুনাপাথর ও ডলোমাইট, রেলপথ, গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড ও দামোদর খালের পরিবহণ ব্যবস্থা ও কলকাতার বাজারকে অবলম্বন করে এই শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতায় মধ্যপ্রদেশের ভিলাইএ লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ভিলাই-এর ৫৫ মাইল দক্ষিণে ডালি-রাজারা থেকে লৌহ, কারগালি ও ঝরিয়া রাণীগঞ্জের কয়লা, স্থানীয় চুনাপাথর (নন্দিনী খনি), স্থানীয় ও অন্যান্য স্থানের ম্যাঙ্গানীজ, বোম্বাই-কলকাতা রেলপথ ও জাতীয় সড়কের সান্নিধ্য, টণ্ডুলা খালের জল সরবরাহ প্রভৃতির সহায়তায় এই শিল্পকেন্দ্রের পত্তন হয়।

পরিকল্পনাকালে এই শিল্পকেন্দ্রগুলির মোট লক্ষ্য ছিল বার্ষিক প্রায় ১০ লক্ষ টন লৌহ-ইস্পাত উৎপাদন। কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ে পরিপূর্ণ হয়নি।

সরকারী আওতায় বোকারোতে সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতায় চতুর্থ শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠছে। ১৯৭৪ সালে এই কেন্দ্রের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২৫ লক্ষ টন ইস্পাতজাত দ্রব্য। ভবিষ্যতে এই উৎপাদন ৫৫ লক্ষ টনে পৌঁছোবার পরিকল্পনা রয়েছে।

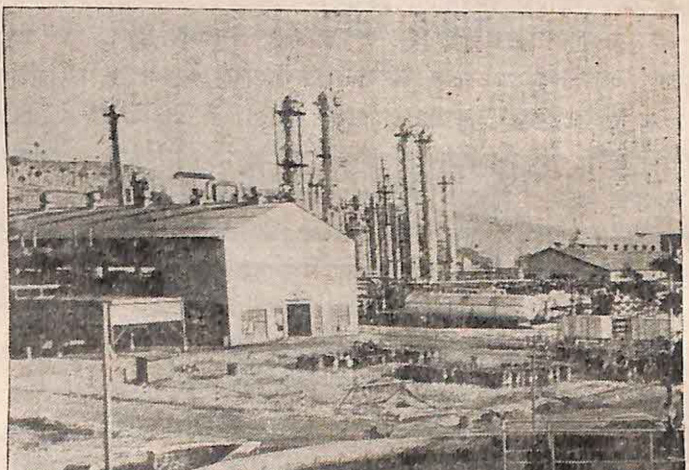
ভবিষ্যতে তামিলনাড়ুর সালেমে, অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে, মহীশূরের হসপেট-বিজয়নগরে ও অন্যান্য স্থানে মিনি স্টীল প্লান্ট গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

লৌহ-ইস্পাত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নানাবিধ কারিগরী বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মধ্যে বিশাখাপত্তনম ও মাজাগনের (বোম্বাই) জাহাজ নির্মাণ শিল্প, খিদিরপুরের স্টীমার লঞ্চ শিল্প; কলকাতার হিন্দুস্থান কার ও বেডফোর্ড ট্রাক, বোম্বাই-এর ফিয়াট কার, ডজ ও ফার্গো ট্রাক, মহীন্দ্র অ্যাণ্ড মহীন্দ্র কাইজার জীপ, মাদ্রাজের স্ট্যাণ্ডার্ড কার, লেল্যাণ্ড-ডিজেল মোটর, টাটা ডিজেল মোটর; চিত্তরঞ্জন (বর্ধমান), টাটা ও বারাণসীর

রেলইঞ্জিন, পেরাম্বুর (তামিলনাড়ু), বাঙ্গালোর, দমদম, আগরপাড়া ও ভরতপুর-এর কোচ ও ওয়াগন; কলকাতা-আসানসোল সহ ক্ষুদ্র বৃহৎ ১৬৮টি সাইকেল শিল্প; কলকাতা, মহীশূর, বাঙ্গালোর, রাঁচী, দিল্লী, বোম্বাই, কোয়েম্বাটুর, নৈনি (এলাহাবাদ), হাওড়া, পুণা, পিঞ্জোর (হরিয়ানা), সিরমুর (হিমাচল), কোটা (রাজস্থান), কালামাসারি (কেরালা) ইত্যাদি স্থানের মেশিন টুল্‌স্ শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (মানচিত্র ৫)।

রাসায়নিক শিল্প : লৌহ-ইস্পাত শিল্পের মত রাসায়নিক শিল্প শিল্পজগতে গুরুত্বপূর্ণ। সবরকম কলকারখানা, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণে ও ওষুধপত্র প্রস্তুত করায় রাসায়নিক শিল্পের অবদান অপরিসীম। নানারকম রং, বার্নিশ তেল, সাবান, পাউডার, এসেন্স, অ্যাসিড, নানাজাতীয় লবণ প্রভৃতি রাসায়নিক শিল্পজাত দ্রব্য।

রাসায়নিক শিল্পে প্রধান প্রধান কাঁচামাল সালফিউরিক অ্যাসিড বা সালফার, কস্টিক সোডা এবং সোডা অ্যাশ বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট। এর মধ্যে সালফার ও কস্টিক সোডা ভারতে পর্যাপ্ত না থাকায় তা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। সোডা অ্যাশ প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় সোডিয়াম ক্লোরাইড, চুনাপাথর, কয়লার কোক ও অ্যামোনিয়া প্রভৃতি ভারতে সুপ্রচুর। বর্তমানে পাইরাইট ও জিপসাম থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড ও সমুদ্র লবণ ও চুনাপাথর থেকে কস্টিক সোডা তৈরি করা হচ্ছে।



ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা, বোম্বাই

গুজরাটের মিথাপুর (জামনগর), পোরবন্দর, দ্রাংগধ্রা, মহারাষ্ট্রের উরান (রত্নগিরি জেলা), রিষড়া, আসানসোল, মেট্টুর, তুতিকোরীন, বারাণসী, জামসেদপুর, বেলাগুনা (মহীশূর) ও আলাউয়ি (কেরালা) রাসায়নিক শিল্প কেন্দ্র (মানচিত্র ৫)। ভারী

রাসায়নিক দ্রব্য যথা সালফিউরিক অ্যাসিড, কস্টিক সোডা ও সোডা অ্যাশ ইত্যাদি কাচ, কার্পাস, পশম, রেয়ন, কাগজ, বিস্ফোরক পদার্থ প্রভৃতি শিল্প ও নানা রাসায়নিক শিল্পে প্রয়োজন হয়।

রাসায়নিক শিল্পের একটি শাখাশিল্প কয়লা থেকে আল্‌কাতরা ও পেট্রল থেকে নানা রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন। বেঞ্জন, ক্রিয়োসট, ন্যাপথা, পিচ, ঔষধপত্র, ডি.ডি.টি প্রভৃতি নানা জিনিস কয়লা ও পেট্রল থেকে তৈরি হয়। চিঙ্গভরম, থানা, দিল্লী, পিম্‌প্রি, হৃষিকেশ, কলকাতা, বোম্বাই, বরোদা, বিড়লাপুর প্রভৃতি স্থানে এই শাখা শিল্প থেকে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও নানা ওষুধ তৈরি হয়।

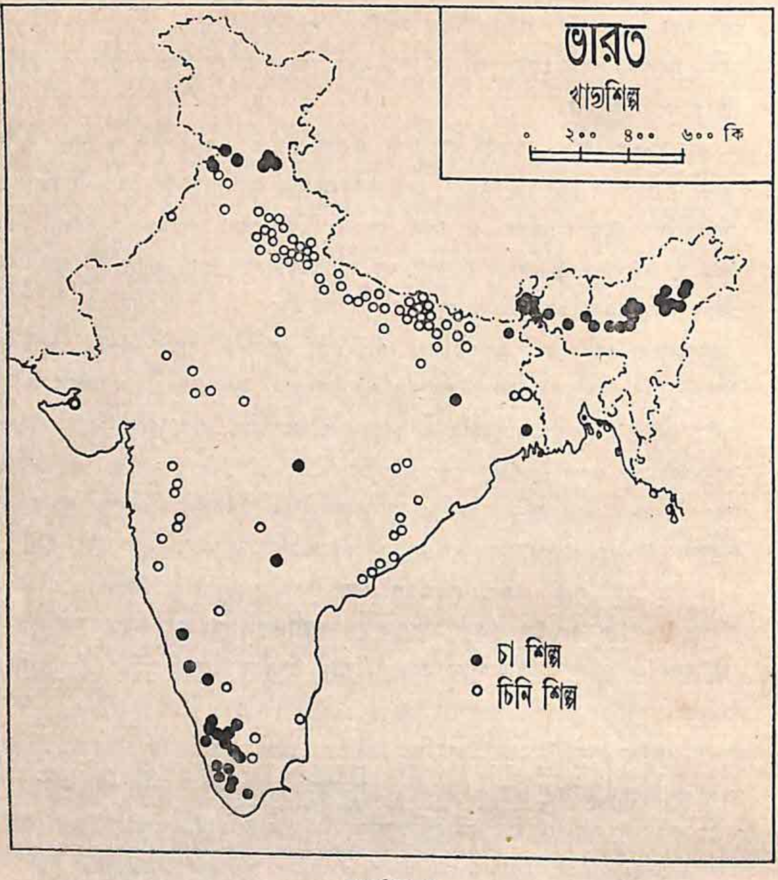
রাসায়নিক সারশিল্প : রাসায়নিক সার শিল্প বর্তমান ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। উন্নত ধরনের চাষের জন্য রাসায়নিক সার অপরিহার্য। মৃত্তিকার প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান—নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, সালফার, পট্যাসিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম, ক্যালসিয়ম ও লোহা। কিন্তু ভারতে প্রধানত (১) নাইট্রোজেন সার ও (২) ফসফেট সার উৎপাদন করা হয়। এই সারের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল জিপসাম, পাইরাইট, ধাতুমল (Basic slag), ন্যাপথা এবং কয়লা ও পেট্রোলিয়মের অ্যামোনিয়া প্রভৃতি।

ভারতে প্রায় ৪৫টি সার কারখানা আছে। তার মধ্যে তামিলনাড়ু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রভৃতি স্থানে এর কেন্দ্রীভবন লক্ষ করা যায় (মানচিত্র ৫)।

চিনিশিল্প : পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতে ইক্ষু উৎপাদন অতি প্রাচীন কৃষিকলা। ইক্ষুচাষ ও চিনির ব্যবহার ভারত থেকে বহু দেশে পৌঁছয়। জাভা, জামাইকা, কিউবা প্রভৃতি দেশের ইক্ষুচিনি ও ইউরোপের বীটচিনি উৎপাদনের আগে ভারতের চিনির ক্ষেত্রে আধিপত্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও এই শিল্পে নিয়োজিত মূলধন, শ্রমিক সংখ্যা ও উৎপাদন মূল্যের পরিমাণ বহু বৃহদায়তন শিল্পের চেয়ে বেশি। বয়নশিল্পের পরই একদিক থেকে চিনি শিল্পের স্থান। চিনি উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান কিউবা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশের সমতুল্য।

আধুনিক প্রথায় চিনি উৎপাদন শুরু ১৯০৩ সাল থেকে। প্রথম চিনি কল বিহারে স্থাপিত হয়। বর্তমানের চিনিকলগুলি উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে কেন্দ্রীভূত (মানচিত্র ৬)। এছাড়া মহীশূর, পাঞ্জাব, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, আসাম ও ওড়িশায় অল্পবিস্তর চিনিকল অবস্থিত। এই চিত্র থেকে বোঝা যায় যে ভারতে সর্বত্র কম বেশি চিনি উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারত ইক্ষু উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয়। ১৯৭০-৭১ সালে ভারতে মোট ২১৫টি চিনিকল ছিল ও চিনি উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ৩৭·৪ লক্ষ টন।

কলের চিনি ছাড়া ভারতে প্রচুর গুড়, খান্দেসার চিনি ও মিছরি তৈরি হয়। ইক্ষু দ্রুতক্ষয়শীল ফসল হিসাবে বেশি দূর পরিবহণের উপযোগী নয়। এই কারণে চিনিকলগুলি ইক্ষুক্ষেত্রের সন্নিকটে অবস্থিত হতে দেখা যায়। যেহেতু ইক্ষু বছরের একটি



মানচিত্র ৬

নির্দিষ্ট সময়ে সংগৃহীত হয়—সেহেতু কলগুলি একমাত্র সেই সময় চালু থাকে। অন্যসময় ইক্ষুশিল্প স্থগিত থাকে। ইক্ষুর ছোবড়া একটি উল্লেখযোগ্য উদ্বৃত্ত। এ থেকে জ্বালানী সংগ্রহ ও অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, হংকং, পূর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান চিনি আমদানীকারক দেশ।

চা-শিল্প: চা-শিল্প ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিভিত্তিক শিল্প। বিদেশী মুদ্রা অর্জনে এই শিল্প অগ্রগামী, রপ্তানী দ্রব্য হিসাবে যন্ত্রপাতি ও পাটজাত দ্রব্যের পরই চায়ের স্থান। চিনিশিল্পের মত এই শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে স্থাপিত হয়। আসাম, উত্তরবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরালা ও হিমাচলপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে চা-শিল্প কেন্দ্রীভূত। এছাড়া বিহার, ত্রিপুরা ও উত্তরপ্রদেশেও কিছু পরিমাণ চা উৎপন্ন হয় (মানচিত্র ৬)। ভারতে মোট ৪০৫টি চা-কল আছে।

চা-উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয়, ভারতীয় চায়ের মধ্যে আসাম ও দার্জিলিং-এর চা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাজ্য ভারতীয় চায়ের সর্ববৃহৎ ক্রেতা। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে যুক্তরাজ্যের লণ্ডন থেকে চা পুনরপ্তানী হয়। শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া ও পর্ব আফ্রিকা বর্তমানে ভারতীয় চায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।

ভারতের অন্যান্য উল্লেখ্য শিল্প কাগজ শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, চীনামাটি শিল্প, কাচ শিল্প, নানা খাদ্য শিল্প ও কুটির শিল্প।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও শিল্পোন্নয়ন

স্বাধীনোত্তর যুগে ভারতের শিল্প সংগঠন ও প্রগতি ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। এই অনুন্নত দেশের শিল্পপ্রসারে প্রকৃতপক্ষে কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ছিল না। ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য জাতীয় অর্থনীতির সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন। শিল্পোন্নয়ন এই পরিকল্পনার একটি বিশেষ দিক। ভারত এখন পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাধীন। এর পূর্বে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মোট নিয়োজিত অর্থের যে অংশ শিল্পপ্রসার ও প্রগতির জন্য ব্যয় হয় তা নিম্নরূপ :

প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	তৃতীয় পরিকল্পনা	চতুর্থ পরিকল্পনা
৮·৪ শতাংশ	১৮·৫ শতাংশ	২৫ শতাংশ	২৩·৪ শতাংশ

ওপরের চিত্র থেকে বোঝা যায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেওয়া না হলেও পরবর্তীকালে তা সংশোধিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে চতুর্থ পরিকল্পনায় তৃতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা নিয়োজিত অর্থের অনুপাত কম হলেও প্রকৃতপক্ষে শিল্পক্ষেত্রেই সর্বাধিক অর্থ নিয়োজিত হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় লৌহ-ইস্পাত, সিমেন্ট, অ্যালুমিনিয়ম, সার, কারিগরী, মেশিন-টুল্‌স্ ও বিভিন্ন গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। এ সময় উল্লিখিত শিল্পের প্রসার ও আধুনিকীকরণ ছিল মূল উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তিনটি নতুন লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রের পত্তন ঘটে ও অন্যান্য বিদ্যমান কেন্দ্রের এই পরিকল্পনাকালে যথেষ্ট উন্নতি হয়। কিন্তু এ সময়ে সার, কাগজ, সিমেন্ট, অ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতি শিল্পে লক্ষ্যমাত্রায় পেঁাছনো সম্ভব হয়নি।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পক্ষেত্রেই সর্বাধিক অর্থ নিয়োজিত হয়। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল মূল শিল্পগুলির সম্প্রসারণ। সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ এ সময় লক্ষণীয়ভাবে কমতে থাকে ও বিদ্যমান শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়।

চতুর্থ পরিকল্পনায় আরব্ধ ও অসম্পূর্ণ শিল্পসমূহের বিনিয়োগ সাফল্যমণ্ডিত করা, শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানী বৃদ্ধি ও আমদানী দ্রব্যের বিকল্প উৎপাদন ও আভ্যন্তরীণ সম্পদের সাহায্যে নতুন শিল্পের ভিত্তি বা কাঠামো তৈরি করা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই পরিকল্পনার শেষে লক্ষ্যমাত্রায় সর্বক্ষেত্রে পৌঁছনো সম্ভব না হলেও বহুলাংশে তা সাফল্য লাভ করেছে বলা যায়।

বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুরের শিল্পবিস্তার, ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণ ও হলদিয়া প্রকল্পের প্রগতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া যেসব নদীপ্রকল্পের ওপর শক্তি বা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয় তার মধ্যে দামোদর-ভ্যালি-করপোরেশন অন্যতম। অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, কংসাবতী পরিকল্পনা, জলঢাকা জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার নাম করা যায়। শক্তি-উৎপাদনে ব্যাণ্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ও সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নামও উল্লেখ্য।

শিল্পক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কেন্দ্র, কয়লাখনির যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উচ্চমান যন্ত্রপাতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। এছাড়া অন্যান্য বিদ্যমান শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকীকরণ অন্যান্য উল্লেখ্য দিক।

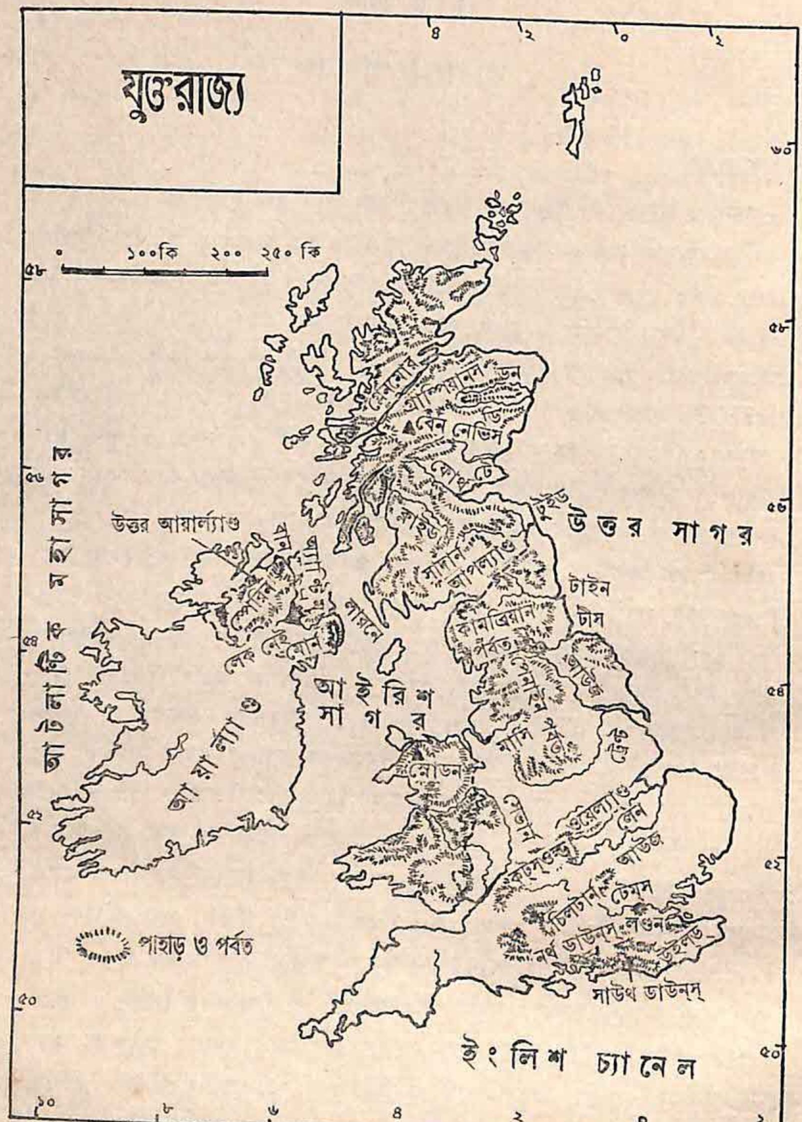
তৃতীয় অধ্যায়

ভারত ও বহির্বিশ্ব

যুক্তরাজ্য

অবস্থান ও আয়তন: ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমে মহাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে সংকীর্ণ ইংলিশ চ্যানেল দ্বারা পৃথকীকৃত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ৪৯°৫৭´ ও ৫৮০°৪০´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ১°৪৬´ পূর্ব ও ৮°১১´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। প্রধান দ্বীপ গ্রেট ব্রিটেন। উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড নামে পরিচিত আয়র্ল্যাণ্ড দ্বীপের উত্তর-পূর্বাংশ এবং আশেপাশের আরও প্রায় পাঁচ হাজার ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে যুক্তরাজ্য গঠিত। দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগরের প্রলম্বিত অংশ ইংলিশ চ্যানেল, পশ্চিমে ও উত্তরে আটলান্টিক মহাসাগর। গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী আইরিশ সাগর ও পূর্বে উত্তর সাগর যুক্তরাজ্যের দ্বীপিয় অবস্থানকে স্পষ্ট করে তুলেছে। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড সমেত যুক্তরাজ্যের মোট আয়তন ২৪৪,৭৫৬ ব কি (মানচিত্র ৭)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে যুক্তরাজ্যকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। ইংলণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমে এক্স (Exe) নদীমুখ থেকে উত্তর-পূর্বে টীস (Tees) নদীমুখ পর্যন্ত অঙ্কিত একটি কাল্পনিক সরলরেখার পশ্চিম ও উত্তর দিকে অবস্থিত ভূভাগ উচ্চভূমি এবং পূর্ব ও দক্ষিণের ভূভাগ নিম্নভূমি দিয়ে গঠিত। উচ্চভূমির অধিকাংশ পর্বতসঙ্কুল হলেও পর্বতসমূহ হিমালয় বা আল্পস্ পর্বতের সঙ্গে কোনভাবে তুলনীয় নয়। এখানকার পর্বতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এগুলো বয়সে হিমালয় ইত্যাদি থেকে অনেক প্রাচীন। বস্তুত উত্তরে অবস্থিত কয়েকটি পর্বত পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম। দীর্ঘ ক্ষয় শিলারাশির কাঠিন্য অনুযায়ী পর্বতাংশকে উচ্চ বা নিম্ন মালভূমিতে রূপান্তরিত করেছে। ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ডিভন ও কর্নওয়ালে এই ধরনের ক্ষুদ্র মালভূমি দেখা যায়। ওয়েল্স অঞ্চলের উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত ক্যামব্রিয়ান পর্বত (সর্বোচ্চ শৃঙ্গ স্নোডন ১০৮৫ মি), উত্তর লেক অঞ্চলের অত্যন্ত বন্ধুর ক্যামব্রিয়ান পর্বত উচ্চভূমির অন্তর্গত। উত্তর ইংলণ্ডের মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত 'ইংলণ্ডের মেরুদণ্ড' নামে পরিচিত পেনাইন পর্বত পশ্চিম অপেক্ষা পূর্বদিকে ঢালু এবং উভয় প্রান্তে নিম্ন উপকূল অঞ্চলের সঙ্গে মিলে গেছে। পেনাইনের পূর্ব ও পশ্চিম ঢালে অজস্র পরিমাণ কয়লা পাওয়া যায়। দীর্ঘকালীন অবক্ষয় এই সব পর্বতের শৃঙ্গদেশে মসৃণতা এনেছে।


যুক্তরাজ্য
১০০কি ২০০ ২৫০ কি
উত্তর সাগর
আটলান্টিক মহাসাগর
উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড
আয়ার্ল্যাণ্ড
আইরিশ সাগর
বেন নেভিস
টুইড
টাইন
টীস
কামব্রিয়ান পর্বত
স্নোডন
লেক নেঈ
ওয়েল্যাণ্ড
টেমস
লণ্ডন
নর্থ ডাউনস্
সাউথ ডাউনস্
ইংলিশ চ্যানেল
পাহাড় ও পর্বত

মানচিত্র ৭

কিন্তু তা সত্ত্বেও উচ্চভূমির বন্ধুরতা লক্ষণীয়। পর্বতাঞ্চলে, বিশেষ করে লেক অঞ্চল ও উত্তর ওয়েল্‌স অঞ্চলে এই ধরনের বন্ধুর ভূপ্রকৃতি ও অসংখ্য ছোট-বড় হ্রদ দেখা যায়। প্রাচীন মহাদেশীয় হিমবাহ পর্বতাঞ্চলে উদ্ভূত হয়ে পর্বতের ঢাল বেয়ে চলার পথে ঘর্ষণজনিত ক্ষয়-কার্যের মাধ্যমে বন্ধুরতা এবং স্থানে স্থানে নদীখাতকে হ্রদে পরিণত করেছে।

তুলনামূলক বিচারে স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমি অধিকতর বন্ধুর। উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত উচ্চভূমি গ্লেন মোর (Glen More) নামক বিরাট অবতলের দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। পশ্চিমাংশ উত্তর-পশ্চিম উচ্চভূমি ও পূর্বাংশ গ্রাম্পিয়ান পর্বত নামে পরিচিত। পৃথিবীর প্রাচীনতম পর্বতের অংশ হিসেবে এখানকার ভূভাগ প্রচণ্ডভাবে ক্ষয় হয়ে অধিকাংশ স্থলে মালভূমির সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন মহাদেশীয় হিমবাহের ক্রিয়ার ফলে এই অঞ্চলে অসংখ্য হ্রদের জন্ম হয়েছে। কোন কোন হ্রদ খুবই গভীর। লখ মোরাবের গভীরতা প্রায় ৩০৫ মি। যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বেন নেভিস (১৩৪৩ মি) এখানে অবস্থিত। 'সাদার্ন আপল্যাণ্ডস' নামে পরিচিত স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশ প্রাচীনতম পর্বতমালার ক্ষয়িত অবশেষ। এই মালভূমির সর্বত্র হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

এছাড়া ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্বাংশে কয়েকটি ছোট ছোট অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়শ্রেণী পরস্পর সমান্তরালভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত। কট্‌স্‌ওল্ড ও চিলটার্ন এই ধরনের পাহাড়। আরও দক্ষিণে পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত নর্থ ও সাউথ ডাউনস এবং উইলড পাহাড়শ্রেণী উল্লেখযোগ্য। প্রধানত নরম শিলাগঠিত অঞ্চল ক্ষয় হয়ে নিম্নভূমির সৃষ্টি করেছে। পেনাইন পর্বতের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত সমভূমির (English Plains) অন্তর্গত মিডল্যাণ্ড প্লেনস বা সমভূমি। ল্যাঙ্কাশায়ার ও চেশায়ার সমভূমি, ডারহাম-নর্দাম্বরল্যাণ্ড সমভূমি, লণ্ডন সমভূমি এবং স্কটল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী সমভূমি বা সেন্ট্রাল লোল্যাণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের ভূভাগ স্কটল্যাণ্ডের সাদার্ন আপল্যাণ্ডস-এর অনুরূপ। প্রাচীন পর্বতের শিলাগঠিত ভূভাগ অবিরাম ক্ষয়ের ফলে মালভূমির সৃষ্টি করেছে। পূর্বাংশে যথাক্রমে আন্ট্রিম পর্বত ও মোর্ন পর্বত এবং পশ্চিমাংশে স্পেরিন পর্বত অবস্থিত। পর্বতের উচ্চতা কোথাও ৮৩০ মিটারের ঊর্ধ্বে নয়। মধ্যভাগে প্রস্ত উপত্যকার অন্তর্গত, প্রায় ৬০ ব কি আয়তনবিশিষ্ট নেই লেক (Neagh Lough) ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম হ্রদ।

সেভার্ন যুক্তরাজ্যের দীর্ঘতম (৩৩৫ কি) নদী। ওয়েলস-এর ক্যাম্ব্রিয়ান পর্বত থেকে নির্গত সেভার্ন দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে ব্রিস্টল চ্যানেলে সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নদীটি জোয়ারের জন্য খ্যাত। জোয়ারের সময় জলের উচ্চতা

১৮ মি পর্যন্ত হতে দেখা যায়। সেভার্নের প্রধান উপনদী আভন। কট্স্ওল্ড থেকে উৎপন্ন টেমস নদী পূর্ববাহিনী। উত্তর সাগরে পতিত অন্যান্য পূর্ববাহিনী নদীর মধ্যে আউজ ও ওয়েলাণ্ড কট্সওল্ড থেকে এবং ট্রেন্ট-আউজ, টীস ও টাইন পেনাইন পর্বত থেকে উৎপন্ন। পেনাইন পর্বত থেকে উৎপন্ন পশ্চিমবাহিনী নদীর মধ্যে মার্সি উল্লেখযোগ্য। স্কটল্যাণ্ডের অধিকাংশ প্রধান নদী পূর্ববাহিনী। টুইড, ফোর্থ, টে, ডি এবং ডন উত্তর সাগরে গিয়ে পড়েছে। ফোর্থ ও টে নদীমুখে বিরাট খাঁড়ির সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবাহিনী নদী ক্লাইড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্লাইডের খাঁড়ি জাহাজ চলাচলের পক্ষে খুবই উপযুক্ত।

উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের দুটি প্রধান নদী লাগান এবং বান যথাক্রমে পূর্ব ও উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে সাগরে উপনীত হয়েছে।

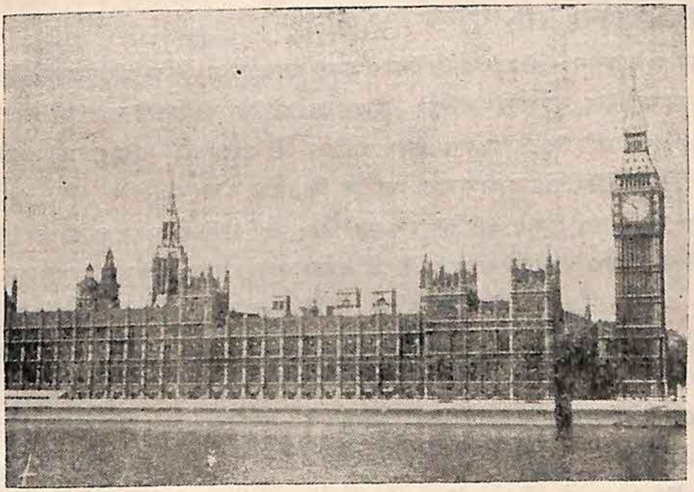
অধিবাসী : যুক্তরাজ্যের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৫৫,৩৫৫,০০০। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ২০১ জন লোকের বাস। কিন্তু ভূমির বন্ধুরতা এবং প্রতিকূল জলবায়ুর জন্য জনঘনত্ব সর্বত্র এক রকম নয়। ওয়েলস-এর পূর্বাংশ, লেক অঞ্চল, পেনাইনের উত্তরাংশ, স্কটল্যাণ্ডের সাদার্ন আপল্যাণ্ডস-এর অধিকাংশ স্থান, প্রায় সমগ্র উত্তর-পশ্চিম পার্বত্যাঞ্চল এবং উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের পশ্চিমাংশে জনঘনত্ব খুব কম। এই সব অঞ্চলের কোথাও কোথাও জনবসতি একেবারে নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে উচ্চভূমি অপেক্ষা নিম্নভূমি অঞ্চলে জনঘনত্ব বেশি। বৈজ্ঞানিক প্রথায় নিবিড় চাষের দ্রুত প্রসার এবং শিল্পক্ষেত্রে প্রচণ্ড অগ্রগতি উচ্চভূমির আপাত প্রতিকূলতা অনেকাংশে দূর করেছে। উচ্চভূমিতে কয়লার অফুরন্ত জোগান এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদের সহজলভ্যতা শিল্পকেন্দ্রীভবনের সহায়ক হয়েছে। বস্তুত পেনাইনের উভয় ঢালে এবং উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে শিল্পকে কেন্দ্র করে যে জনঘনত্বের সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনা নিম্নভূমি অঞ্চলের খুব কম স্থানেই দেখা যায়।

যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের প্রায় ৮০ শতাংশ শহর বা নগরে বাস করে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে জনসাধারণের এত বিরাট অংশ পৌরবাসী হিসেবে দেখা যায় না। শিল্পের অবাধ বিকাশ এবং কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিকীকরণ এর মূল কারণ। এখানকার গ্রামগুলিতেও পৌরজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায়।

রাজধানী : লণ্ডন (জনসংখ্যা ৭,৩৭৯,০১৪ : ১৯৭১ সাল): যুক্তরাজ্যের রাজধানী লণ্ডন পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম মহানগর। টেমস্ নদীর উভয় প্রান্তে, নদীমুখ থেকে ৫৯ কি অভ্যন্তরে এই মহানগর গড়ে উঠেছে। লণ্ডনের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় ৪৩ সালে টেম্স্ নদীর উত্তর তীরে রোমীয়রা লণ্ডিনিয়াম (Londinium) নামে একটি ছোট প্রাচীরবেষ্টিত শহর প্রতিষ্ঠা করে এবং ঐ স্থানে নদীর ওপর প্রথম সেতুটি নির্মাণ করে। শহর প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যবসায়ী এবং শিল্পকারিগর এসে ভীড় করতে থাকে, যার ফলে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ লণ্ডনের জনসংখ্যা



লণ্ডনের রাজপথ



লণ্ডনের পার্লামেন্ট ভবন

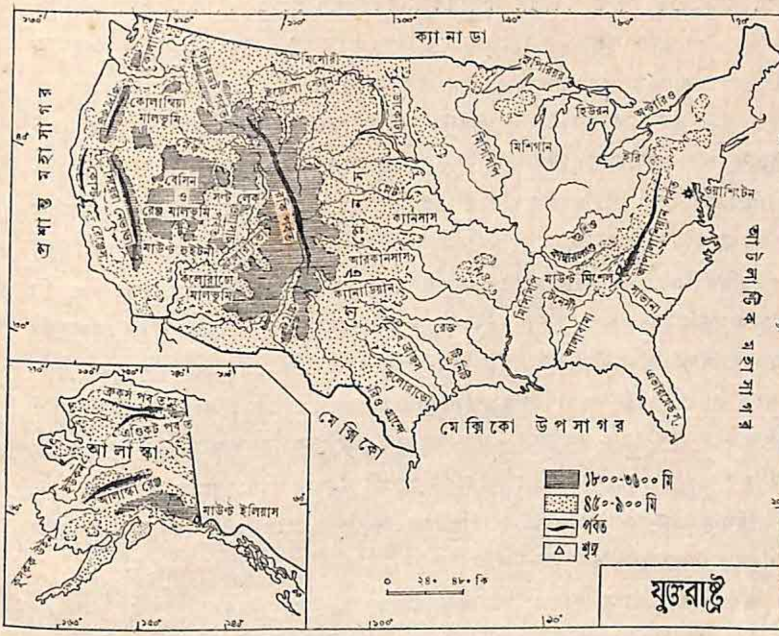
১৫০০০ ছাড়িয়ে যায়। পঞ্চম শতাব্দীতে রোমীয়রা লণ্ডন ত্যাগ করার পর কিছুকাল শহরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান স্থানটির পুনরুজ্জীবন ঘটাতে সাহায্য করে। নবম শতাব্দীর শেষভাগে আলফ্রেড এখানে রাজধানী স্থাপন করে শহরকে পুনর্গঠন করেন। সেই দিন থেকে লণ্ডনের জীবন

এবং প্রসার অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে বন্দর, শিল্প ও বাণিজ্য, শিক্ষা ও চারুকলা এবং প্রশাসনকেন্দ্র হিসেবে লণ্ডন যুক্তরাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। এখানকার বন্দর মারফৎ বৎসরে প্রায় ৫৬০ লক্ষ টন সামগ্রীর আদান-প্রদান হয়ে থাকে। টেম্‌স্‌ নদীর উভয় তীর জুড়ে অনেকগুলি বিরাট ডক ও অজস্র গুদামঘর গড়ে উঠেছে। মহানগরের অসংখ্য কল-কারখানার মধ্যে যন্ত্রপাতি ও কারিগরি শিল্প, ভোজ্যবস্তু শিল্প, পোশাক-তৈরি শিল্প, কাঠ শিল্প, ছাপাখানা শিল্প ইত্যাদি প্রধান। এছাড়া তৈলপরিশোধন, চিনি শিল্প এবং সিমেন্ট শিল্পও গুরুত্ব লাভ করেছে। মোট অধিবাসীর প্রায় ১০ লক্ষ শিল্পকার্যে নিয়োজিত। মহানগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য সরকারী ও বেসর-কারী কার্যালয়, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ছোট থেকে বিরাটাকৃতি অজস্র দোকানপাট, প্রেক্ষাগৃহ, অগণিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান করে থাকে। পৃথিবীর কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর পাঠাগার, চিত্রশালা ও যাদুঘর লণ্ডনের প্রধান আকর্ষণ। এখানকার প্রাচীন স্থপতিশৈলীর নিদর্শন 'টাওয়ার অব লণ্ডন', পার্লামেন্ট ভবন, ওয়েস্টমিনস্টার এ্যাবে, সেন্ট পল গির্জা ইত্যাদি নানা রকম দর্শনীয় বস্তু বিদেশীদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

যুক্তরাষ্ট্র

অবস্থান ও আয়তন: উত্তর আমেরিকার সমগ্র মধ্যভাগ ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আলাস্কাকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। আলাস্কা ব্যতীত যক্তরাষ্ট্রের প্রধান ভূভাগ ২৪°৩৩´ ও ৪৯° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৬°৫৭´ ও ১২৪°৪৫´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এবং এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, সামোয়া, গুয়াম ইত্যাদি দ্বীপপঞ্জ এবং আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত পুয়ের্তো রিকো ও পানামা খালের সন্নিহিত এলাকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে প্রশান্ত মহা-সাগর এবং পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর; উত্তরে কানাডা এবং দক্ষিণে মেক্সিকো। পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম দেশ যুক্তরাষ্ট্র আয়তনে প্রায় ইউরোপ মহাদেশের সমান। পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল থেকে পূর্বদিকে আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত দেশের বিস্তৃতি প্রায় ৪৮৩০ কি। যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৯,৩৬৩,৩৯৬ ব কি (মানচিত্র ৮)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: যুক্তরাষ্ট্রকে তিনটি প্রধান ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়; যথা, পূর্বের উচ্চভূমি অঞ্চল, পশ্চিমের পার্বত্য ও মালভূমি অঞ্চল এবং মধ্যভাগের বিরাট সমভূমি অঞ্চল। ওয়েস্টার্ন কর্ডিলেরা পর্বতশ্রেণী ও অন্তর্বর্তী মালভূমিসমূহ পশ্চিমভাগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিকার করে রয়েছে। কাসকেড পর্বত, সিয়েরা নেভাডা এবং রকি পর্বত সম্মিলিতভাবে ওয়েস্টার্ন কর্ডিলেরা নামে পরিচিত। কাসকেড পর্বতে কয়েকটি বিরাট আগ্নেয়গিরি আছে। সিয়েরা



মানচিত্র ৮

নেভাডার পশ্চিম ঢাল মৃদু, কিন্তু পূর্ব ঢাল অত্যন্ত খাড়া। এই পর্বতের মাউন্ট হুইটনী শৃঙ্গ ৪৪১৮ মি উঁচু। উপকূলভাগে কোস্ট রেঞ্জেস পর্বতশ্রেণীর বিভিন্ন শাখা সমান্তরাল ভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিচ্ছিন্নরূপে প্রসারিত। এক দিকে কোস্ট রেঞ্জেস ও অন্য দিকে কাসকেড ও সিয়েরা নেভাডার মধ্যবর্তী অংশে বিখ্যাত পাগেট সাউণ্ড নিম্নভূমি, উইলামেট উপত্যকা এবং ক্যালিফোনিয়া উপত্যকা অবস্থিত। সিয়েরা নেভাডা ও কাসকেড পর্বতের পূর্বদিকে রকি পর্বতশ্রেণী দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট পার্বত্য ভূভাগের সৃষ্টি করেছে। রকি পর্বতের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিটাররূট এবং ওয়াসাচ পর্বত উল্লেখযোগ্য। মধ্যভাগে রকির গড় উচ্চতা প্রায় ৪২০০ মি। রকি পর্বত খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সিয়েরা নেভাডা ও কাসকেড এবং রকি পর্বতের অন্তর্বর্তী বিস্তৃত ভূভাগ জুড়ে তিনটি বিশাল মালভূমির সৃষ্টি হয়েছে; যথা, কোলাম্বিয়া মালভূমি, বেসিন ও রেঞ্জ মালভূমি এবং কলোরাডো মালভূমি। বেসিন ও রেঞ্জ মালভূমির মধ্যভাগে সল্ট লেক নামে একটি বৃহৎ হ্রদ বর্তমান। রকি পর্বতের পূর্ব প্রান্ত থেকে পূর্বদিকে আপালাশিয়ান পর্বত অবধি বিস্তৃত বিরাট সমভূমি অঞ্চলের পশ্চিমাংশ 'গ্রেট প্লেন্‌স্' (Great Plains)

নামে পরিচিত। রকি পর্বতের পাদদেশ (১৫০০ মি) থেকে পূর্বদিকে প্রায় ৩০০ মি পর্যন্ত ক্রমশ ঢালু ভূভাগ গ্রেট প্লেন্‌সের অন্তর্গত। স্থানে স্থানে ছোট ছোট পাহাড় এবং অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত রুদ্রভূমি ভিন্ন এখানকার ভূভাগ সমতল এবং বৃক্ষবিহীন। ছোট ঘাস এই অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ। গ্রেট প্লেন্‌সের পূর্বদিক থেকে আপালাশিয়ান পর্যন্ত প্রসারিত অপেক্ষাকৃত নিম্ন সমভূমিকে সেন্ট্রাল লোল্যাণ্ড (Central Lowland) বলা হয়। অধিকতর বৃষ্টিপাতের জন্য এখানে দীর্ঘ ঘাস জন্মায়। সমভূমির উত্তর প্রান্তে সুপিরিয়র, মিশিগান, হিউরন, ইরি ও অন্টারিও নামে বৃহৎ পঞ্চহ্রদ অবস্থিত। সমভূমির পূর্বপ্রান্তে প্রাচীন আপালাশিয়ান পর্বতমালা প্রচণ্ড ক্ষয় হয়ে ৪৫০-৯০০ মি উঁচু মালভূমির সৃষ্টি করেছে। এই মালভূমি উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। আপালাশিয়ানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট মিশেল ২০৪৫ মি উঁচু। উপকূল জুড়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ বিস্তৃত উপকূলীয় সমভূমি স্থানে স্থানে জলাভূমির সৃষ্টি করেছে। ফ্লোরিডার অন্তর্গত এভারগ্লেড্‌স্‌ এই ধরনের জলাভূমি। উপকূলরেখা সর্বত্র অত্যন্ত ভগ্ন প্রকৃতির এবং কয়েকটি বিশাল পোতাশ্রয়ের জন্ম দিয়েছে। নিউইয়র্ক এই ধরনের একটি পোতাশ্রয়কে অবলম্বন করে পৃথিবীর বৃহত্তম বন্দরে পরিণত হয়েছে।

মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আলাস্কা মূলত পার্বত্য অঞ্চল। দক্ষিণে যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূভাগ থেকে বিস্তৃত কোস্টাল রেঞ্জেস পর্বতমালা ক্যানাডার মধ্য দিয়ে আলাস্কার দক্ষিণ উপকূলে প্রসারিত। এখানে ঐ পর্বত যথাক্রমে আলাস্কা রেঞ্জ ও এলিউশিয়ান রেঞ্জ নামে পরিচিত। এলিউশিয়ান পর্বত পশ্চিম দিকে আলাস্কা উপদ্বীপের ভেতর দিয়ে এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত। এই পর্বত পৃথিবীর একটি বৃহত্তম আগ্নেয় পর্বতের সৃষ্টি করেছে। ঐ পর্বতের পাভলভ আগ্নেয়শৃঙ্গ ২৭১৩ মি উঁচু। আলাস্কা পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট ইলিয়াসের উচ্চতা ৫৪৮৯ মি। আলাস্কার উত্তর ভাগে এণ্ডিকট পর্বত ও ব্রুক্‌স্‌ পর্বত পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। মধ্যভাগে ইয়ুকন ও কুসকক্‌উইন নদীর সংকীর্ণ উপত্যকা ভিন্ন একমাত্র উত্তর ও পশ্চিম উপকূল জুড়ে সমভূমি বর্তমান। উপকূলরেখা অত্যন্ত ভগ্নপ্রকৃতির।

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বার্ধে প্রবাহিত মিসৌরী মিসিসিপি সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী (৬২০০ কি)। রকি পর্বত থেকে উৎপন্ন মিসৌরী দীর্ঘপথ প্রবাহিত হবার পর গ্রেট প্লেন্‌সের পূর্বভাগ থেকে উৎপন্ন মিসিসিপির সঙ্গে মিলিত হয়ে দক্ষিণবাহিনী অবস্থায় মেক্সিকো উপসাগরে পড়েছে। মিসৌরী মিসিসিপির প্রধান উপনদীর মধ্যে টেনেসী, কাম্বারল্যাণ্ড, ওহাইও, ইলিনয়, উইসকনসিন, ইয়েলোস্টোন, প্লেট, ক্যানসাস, আরকানসাস, কানাডিয়ান এবং রেড নদী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উত্তর-পূর্বে সেন্ট লরেন্স নদী শেষ পর্যন্ত ক্যানাডার ভেতর দিয়ে আটলান্টিকে পড়েছে। আটলান্টিকে পতিত অসংখ্য ছোট ছোট নদীর মধ্যে হাডসন, ডেলাওয়ারে, পোটোম্যাক ও সাভানা এবং

মেক্সিকো উপসাগরে পতিত আলাবামা, সেবাইন, ট্রিনিটি, ব্রাজস, কলোরাডো এবং রিও গ্রান্দে প্রধান। দেশের পশ্চিমার্ধে কলোরাডো এবং কোলাম্বিয়া ও তার উপনদী স্নেক এবং ক্লার্ক রকি পর্বতে উৎপন্ন হয়ে যথাক্রমে ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত হয়েছে।

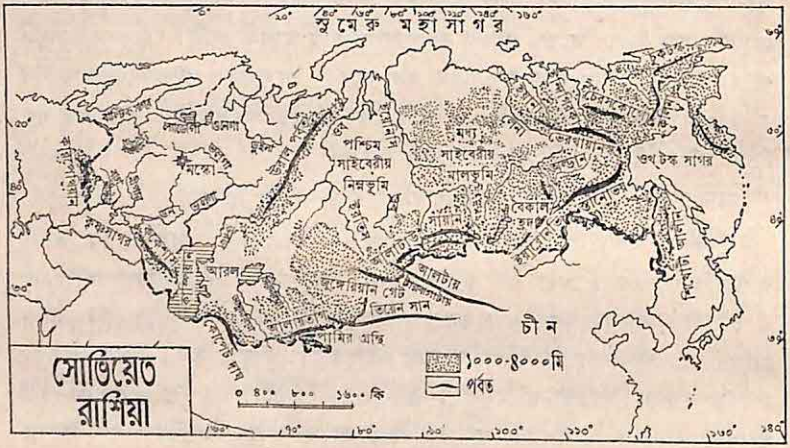
অধিবাসী : যুক্তরাষ্ট্রের মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২০৩,২৩৫,০০০। অধিবাসীরা প্রধানত ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত। ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপীয়রা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে প্রথম স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করে এবং পরবর্তী দুশ বছরের মধ্যে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এখানকার আদি অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানরা সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য। প্রধানত বন্ধুর ভূপ্রকৃতি, স্বল্প বৃষ্টিপাত ও কর্ষণযোগ্য ভূমির অভাবে দেশের পশ্চিমার্ধ খুবই জনবিরল। অন্যদিকে সমতলভূমি, অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, কয়লা, লৌহ ও খনিজ তৈল ইত্যাদির অঢেল সরবরাহ এবং সর্বোপরি আটলান্টিক উপকূলের মাধ্যমে ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ অধিকাংশ অধিবাসীকে দেশের পূর্বার্ধে কেন্দ্রীভূত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বর্গ কিলোমিটার ভূমিতে গড় ২১ জন লোকের বাস হওয়া সত্ত্বেও পূর্বার্ধে জনঘনত্বের হার অনেক বেশি। উপকূল অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩১৪ জন লোক বাস করে। সে তুলনায় পশ্চিমার্ধের মালভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলে জনঘনত্বের হার ১ থেকে ৩ এবং আলাস্কার প্রতি ছয় বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ১ জন অধিবাসী দেখা যায়।

যক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৭০ শতাংশ অধিবাসী শহর ও নগরের বাসিন্দা।

রাজধানী : ওয়াশিংটন (জনসংখ্যা ৭৫৬,৫১০ : ১৯৭০) : যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি (১৭৮৯-১৭৯৭) জর্জ ওয়াশিংটনের নামানুসারে তাঁর নির্বাচিত মেরীল্যাণ্ড ও ভার্জিনিয়া রাজ্যের দান করা ১৬৬ ব কি ভূমিকে কেন্দ্র করে পোটোম্যাক নদীর ধারে ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে ওয়াশিংটন নগরের পত্তন হয়। পিয়ের লাফাঁ নামক একজন ফরাসী স্থপতির পরিকল্পনা অনুযায়ী এই নগর নির্মিত হয়। পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর উদ্যাননগর ওয়াশিংটন সরকারী কার্যালয় ও অসংখ্য জাতীয় স্মৃতিসৌধের কেন্দ্র এবং লোকসংখ্যার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নবম স্থানের অধিকারী। নগরের কেন্দ্রস্থলে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ 'হোয়াইট হাউস' এবং পূর্বভাগে রাষ্ট্রের আইনসভা 'দ ক্যাপিটল' স্থপতিশৈলীর অপূর্ব নিদর্শন। প্রশাসনিক গুরুত্ব ব্যতীত শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের বিশেষ খ্যাতি আছে। এখানে পাঁচটি বিখ্যাত বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। এখানকার 'লাইব্রেরী অব কংগ্রেস' পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে বইয়ের তাকের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৩৫ কি এবং বই ইত্যাদির সংখ্যা চার কোটি দশ লক্ষ। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের যাদুঘর, জাতীয় চিত্রশালা এবং জাতীয় চিড়িয়াখানা ইত্যাদি দেখার জন্য প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পর্যটকের সমাগম হয়।

সোভিয়েত রাশিয়া

অবস্থান ও আয়তন : ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক্‌স্ (U.S.S.R.) বা সোভিয়েত রাশিয়া ইউরোপের পূর্বাংশ এবং এশিয়া মহাদেশের সমগ্র উত্তরাংশকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই দেশটি ৩৫°৮´ ও ৭৭°৪৩´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৯°৩৯´ ও ১৬৯°৩৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। সোভিয়েত রাশিয়ার উত্তরে সুমেরু মহাসাগর এবং পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর ; উত্তর-পশ্চিমে নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ড ; পশ্চিমে পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গারি, রুমানিয়া ; দক্ষিণে তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান, চীন, মঙ্গোলিয়া এবং কোরিয়া। উত্তর গোলার্ধের প্রায় অর্ধেক জুড়ে পশ্চিম থেকে পূর্বে ১১০০০ কি এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ৫০০০ কি বিস্তৃত। পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ ভূভাগের অধিকারী সোভিয়েত রাশিয়া আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র এবং লোকসংখ্যায় তৃতীয় স্থানের অধিকারী। এই দেশের মোট আয়তন ২২,৪০০,০০০ ব কি (মানচিত্র ৯)।



মানচিত্র ৯

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী : ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সমগ্র দেশটিকে প্রায় সম আয়তনবিশিষ্ট দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। ইয়েনিসি নদীর পশ্চিমার্ধে নিম্নভূমি ও নিচু পাহাড়ের প্রাধান্য দেখা যায়। পূর্বার্ধ উচ্চপর্বতমালা ও মালভূমির সমন্বয়ে গঠিত।

উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রলম্বিত উরাল পর্বত পশ্চিমার্ধকে দুই অংশে বিভক্ত করেছে। উরালের পশ্চিমে ইউরোপের অন্তর্গত বিরাট সমভূমি বা 'রাশ্যান প্ল্যাটফর্ম' অবস্থিত। উত্তরে সুমেরু মহাসাগর থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত,

প্রায় বৈশিষ্ট্যবিহীন সমভূমির কয়েকটি স্থানে নিচু পাহাড় এবং মালভূমিসদৃশ অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি একমাত্র বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। এই সব পাহাড় ও উচ্চ-ভূমির মধ্যে মস্কোর নিকটবর্তী ভল্ডাই পাহাড়ের সর্বোচ্চ উচ্চতা মাত্র ৩২৪ মি। সমভূমির উত্তরাংশে প্রাচীন হিমবাহের ঘর্ষণজনিত ক্ষয়কার্যের ফলে অসংখ্য ছোট-বড় হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে ল্যাডোগা ও ওনেগা সর্ববৃহৎ। উত্তর-পশ্চিমে কোলা অন্তরীপে অত্যন্ত প্রাচীন খিবিনি পর্বত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বন্ধুর ভূভাগে পরিণত হয়েছে। এখানেও হিমবাহ-রচিত অনেক হ্রদ আছে। দক্ষিণাংশে কাস্পিয়ান সাগরের নিকটে সমুদ্রাঙ্ক থেকে নিচু কাস্পিয়ান 'ডিপ্রেশন' বা নিম্নভূমি অবস্থিত। সমভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমে কার্পেথিয়ান পর্বত এবং দক্ষিণে ককেশাস পর্বত বিরাট প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ধনুকের জ্যায়ের মত প্রসারিত কার্পেথিয়ানের মধ্যভাগ রাশিয়ার অন্তর্গত। এখানে পর্বতের উচ্চতা ৪৬০ থেকে ১৯৮০ মি। কৃষ্ণসাগরের উপকূল থেকে পূর্বদিকে কাস্পিয়ানের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ককেশাস পর্বত একটি প্রধান জলবিভাজিকার কাজ করছে। ককেশাসের ৪২৭০ মি উঁচু শৃঙ্গদেশ চিরতুষারাবৃত।

ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের সীমা-নির্দেশক উরাল বা রাশিয়ান ভাষায় 'শিলা' পর্বত কয়েকটি সমান্তরাল শাখা নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ২০০০ কি বিস্তৃত। উরালের পশ্চিম-ঢাল অপেক্ষা পূর্ব-ঢাল অনেক বেশি খাড়া। কার্পেথিয়ান ও ককেশাস থেকে বয়সে প্রাচীন এই পর্বত অত্যন্ত ক্ষয় হয়ে মধ্যভাগে প্রায় ৪০০ মিটারে নেমে এসেছে। উরালের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (১৮৮৫ মি) উত্তরাংশে অবস্থিত। এই পর্বতশ্রেণীর পূর্ব দিকে বিরাটাকৃতি পশ্চিম সাইবেরীয় নিম্নভূমি রাশিয়ার ইউরোপীয় সমভূমি অপেক্ষা নিচু এবং স্থানে স্থানে জলাভূমির সৃষ্টি করে উত্তরাভিমুখে ক্রমে ঢালু হয়ে গেছে। দক্ষিণ প্রান্তে এই নিম্নভূমি তুরাণ নিম্নভূমির সঙ্গে মিশেছে। কাস্পিয়ান ও আরল হ্রদের মধ্যভাগে অবস্থিত তুরাণ নিম্নভূমি বৈশিষ্ট্যবিহীন শুষ্ক বালুকাময় মরু অঞ্চলের জন্ম দিয়েছে। পশ্চিম সাইবেরীয় নিম্নভূমির পূর্বদিকে অবস্থিত ইয়েনিসি ও লেনা নদীর মধ্যবর্তী অংশ 'মধ্য-সাইবেরীয় মালভূমি' নামে পরিচিত। প্রায় ৩০০-১০০০ মি উঁচু এই মালভূমি অত্যন্ত ব্যবচ্ছিদিত প্রকৃতির। লেনার পূর্ব প্রান্ত থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ভূভাগ পর্বতমালা, অবক্ষয়িত মালভূমি এবং অন্তর্বর্তী ক্ষুদ্রাকৃতি সমভূমি সমেত অত্যন্ত বন্ধুর এবং জটিলতম ভূপ্রকৃতির রূপ নিয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের মত এশীয় অংশেও উল্লিখিত নিম্নভূমি-সমূহে অর্ধ-বৃত্তাকারে ঘিরে পর পর অনেকগুলি পর্বতশ্রেণী প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত। তুরাণ নিম্নভূমির দক্ষিণে কাস্পিয়ানের পূর্ব উপকূল থেকে বিস্তৃত কোপেট দাঘ পর্বত মূলত ইরানের অন্তর্ভুক্ত হলেও এখানে তার উচ্চতা প্রায় ৮৮৫ মি। আরও

পূর্বে অবস্থিত বিখ্যাত পামির মালভূমি বা 'পৃথিবীর ছাদ' (Roof of the World) থেকে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত চিরতুষারাবৃত আলায়-তাগ সোভিয়েত রাশিয়ার উচ্চতম পর্বতশ্রেণী। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউণ্ট কমিউনিজম (৭৪৯৭ মি) এই পর্বতের অন্তর্গত। উত্তরে অবস্থিত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রসারিত তিয়েনসান পর্বত চীনের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। পর্বতের বিভিন্ন শাখার অন্তর্বর্তী অবতলের মধ্যে প্রায় ১৬-৪০ কি প্রশস্ত এবং ১৬০০ কি দীর্ঘ ফারগান অবতল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিয়েনসান এবং তার উত্তরে অবস্থিত টারবাগাটায় পর্বতের মধ্যবর্তী জুঙ্গেরিয়ান গেট প্রাচীনকাল থেকে চীন ও ইউরোপের মধ্যে প্রধান বাণিজ্যিক পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। টারবাগাটায় পর্বতের উত্তর-পূর্বদিকে যথাক্রমে আলটায়, আলা-টাউ এবং সায়ান পর্বত অবস্থিত। আলটায় পর্বত পামির এবং তিয়েনসানের মত বন্ধুর নয়। আলটায়ের ভূপ্রকৃতি অনেকটা মালভূমিসদৃশ, যদিও এর উচ্চতা স্থানে স্থানে ৪২৬৮ মিটারের উর্ধ্বে। আলা-টাউ এবং বৈকাল হ্রদ পর্যন্ত প্রসারিত সায়ান পর্বতে অবক্ষয়ের মাত্রা অনেক স্থানে সমোচ্চ শৃঙ্গদেশের সৃষ্টি করেছে। বৈকাল হ্রদের পূর্বে সমগ্র অঞ্চল অত্যন্ত পার্বত্য, বন্ধুর প্রকৃতির। এখানে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রসারিত ইয়াব্লোনোভি পর্বতমালার প্রশান্ত, মসৃণীকৃত শৃঙ্গদেশ ১২২০-১৬৮০ মি উঁচু এবং স্থানে স্থানে পর্বত-অন্তর্বর্তী অবতলের জন্ম দিয়েছে। আরও উত্তরে স্তানোভয় পর্বত উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত বিরাট অবক্ষয়িত প্রাচীরের সৃষ্টি করেছে। এই পর্বতের উচ্চতা প্রায় ২৪৪০ মি। ভেরখয়ান্স্ক এবং কলিমা পর্বতদ্বয় সম্মিলিত ভাবে একটি বৃত্তচাপের আকারে উপকূল জুড়ে প্রসারিত। এর মাঝখানে চেরসকোগো পর্বত। প্রত্যেকটি পর্বত অত্যন্ত ব্যবচ্ছেদিত, হিমবাহের দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে দুরতিক্রম্য ভূপ্রকৃতির সৃষ্টি করেছে। পর্বতগুলির উচ্চতা ৩০৫০ মিটারের উর্ধ্বে। উত্তর-পূর্ব প্রান্তে চুকট পর্বত উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সব পর্বতের মধ্যবর্তী অংশে বিশালাকৃতি মালভূমি দেখা যায়। স্তানোভয়ের পূর্বদিকে আমুর নদীর অব্যবহিত পূর্বে উপকূলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রসারিত শিখোটী-আলীন পর্বত ৬০০-৯০০ মি উঁচু আটটি সমান্তরাল শাখা নিয়ে গঠিত। কামচাটকা অন্তরীপে দুটি সমান্তরাল, প্রায় ৩০৫০ মি উঁচু আগ্নেয় পর্বতশ্রেণী উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত। এই পর্বতের পূর্ব শাখায় দশটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে। সাখালিন দ্বীপপুঞ্জও পর্বতময়।

রাশিয়ার নদীগুলি ভূ-ঢাল অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত। ইউরোপীয় রাশিয়ার দীর্ঘতম নদী ভোলগা (৩৬৮১ কি) ভল্ডাই উচ্চভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণে কাস্পিয়ান সাগরে পড়েছে। ভোলগা খাল দ্বারা অন্যান্য নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মস্কোকে উত্তর ও দক্ষিণের পাঁচটি সাগরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করেছে। নীস্তার, বাগ এবং নীপার কৃষ্ণসাগরে এবং ডন আজভ সাগরে পতিত হয়েছে। উত্তরাংশের নদীর মধ্যে

পশ্চিম ভীনা বল্টিক সাগরে, ওনেগা ও উত্তর ভীনা শ্বেত সাগরে এবং মেজেন ও পেচোরা সুমেরু মহাসাগরে বিলীন হয়েছে। পূর্বদিকে সাইবেরিয়াতে পৃথিবীর কয়েকটি দীর্ঘতম নদী প্রবাহিত। আলটায় পর্বত থেকে নির্গত ওব এবং ইরতিস (সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ৫২০০ কি) পশ্চিম সাইবেরীয় সমভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উত্তরে সুমেরু মহাসাগরে পতিত হয়েছে। ঐ মহাসাগরে পতিত অন্যান্য নদীর মধ্যে যথাক্রমে ইয়েনিসি (৩৮০০ কি), লেনা (৪২৫৭ কি), ইসানা, ইন্দিগিরকা, কলিমা ইত্যাদি এবং বৈকাল হ্রদ থেকে উৎপন্ন ইয়েনিসির শাখা নদী আঙ্গারা এবং বৈকালে পতিত সেলেঙ্গা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বে ওখটস্ক সাগরে বিলীন আমুর দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী (৪৩৪৭ কি)। সাইবেরিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে যথাক্রমে তিয়েনসান পর্বত এবং পামির গ্রন্থি থেকে নির্গত সির দরিয়া (২১৩৬ কি) এবং আমুদরিয়া (২৫৩৯ কি) আরল সাগরে পড়েছে। কাস্পিয়ান সাগরে পতিত উরাল একটি উল্লেখ-যোগ্য নদী।

সোভিয়েত রাশিয়াতে অসংখ্য ছোট-বড় হ্রদের মধ্যে কাস্পিয়ান লবণ হ্রদ বৃহত্তম (৩৮৮,০০০ ব কি)। হ্রদটি সমুদ্রাঙ্ক থেকে ২৮ মি নিচু। বৈকাল (৩১০০০ ব কি) বৃহত্তম স্বাদু-জল হ্রদ। এছাড়া আরল হ্রদ এবং বলখাশ হ্রদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অধিবাসী: এই দেশে মোট ২৪১,৭০০,০০০ লোকের বাস। বন্ধুর ভূপ্রকৃতি, হিমশীতল অথবা মরুপ্রায় জলবায়ু এবং ঘন অরণ্যের জন্য দেশের বিরাট অংশ বাসোপযোগী নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পশ্চিম সাইবেরীয় সমভূমি থেকে আরম্ভ করে রাশিয়ার পূর্ব উপকূল পর্যন্ত অঞ্চল প্রায় জনমানবশূন্য। এই অঞ্চল জুড়ে পৃথিবীর বৃহত্তম সরলবর্গীয় অরণ্যের অবস্থান এবং এর উত্তরাংশে তীব্র শীত ও হ্রস্ব গ্রীষ্মকাল মনুষ্য বসবাসের পক্ষে অনুপযুক্ত। সরলবর্গীয় অরণ্যভূমির দক্ষিণে জনবসতি কিছুটা বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু ওখানকার শুষ্ক জলবায়ুর জন্য প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ২ থেকে ১০ জন লোক বাস করে। জনঘনত্ব দেশের পশ্চিমদিকে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপীয় সমভূমির পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং মধ্যভাগে জনঘনত্ব সর্বাধিক। প্রতি বর্গকিলোমিটার ভূমিতে জনঘনত্বের হার পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে।

সোভিয়েত রাশিয়ার মোট অধিবাসীর ৫৫ শতাংশ শহর ও নগরের বাসিন্দা।

রাজধানী: মস্কো (জনসংখ্যা ৭,৩০০,০০০ : ১৯৭২)। ভোলগা ও ওকার উপনদীর তীরে অবস্থিত মস্কো সোভিয়েত রাশিয়ার রাজধানী, দেশের বৃহত্তম এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম মহানগর। ১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মস্কোর পত্তন হয় এবং পূর্বদিক থেকে আগত মঙ্গোলীয় তাতারদের ঘন ঘন আক্রমণের মুখে অরণ্যাঞ্চলে অবস্থিত এই স্থানটির সামরিক নিরাপত্তা ধীরে ধীরে গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মস্কোতে প্রথম দেশের রাজধানী স্থাপিত হয় এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাকার-

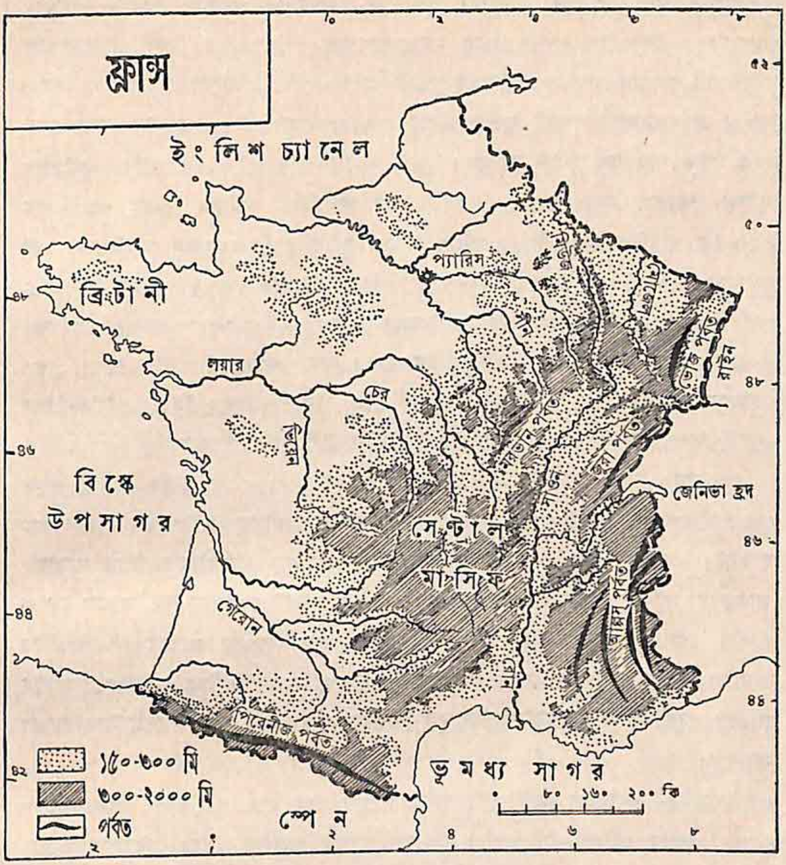
বেষ্টিত বিখ্যাত ক্রেমলিন রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়। ভোলগা, নীপার এবং ভীনা নদীপথে মস্কৌ দেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে রাশিয়ার সম্রাট পিটার দি গ্রেট ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের উপকূলে সেন্ট পিটার্সবুর্গ (বর্তমানে লেনিন-গ্রাদ) নামক এক নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা করে রাজধানী সেখানে স্থানান্তরিত করেন। ১৯১৮ সালে লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হবার পর মস্কৌ সোভিয়েত রাশিয়ার রাজধানী হিসেবে তার হৃতগৌরব ফিরে পায়।

পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে মস্কৌর জনসংখ্যা তিনগুণ বর্ধিত হয়েছে এবং বর্তমানে এই মহানগর শিল্প, বাণিজ্য, প্রশাসন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমগ্র দেশের নাভিকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানকার অগণিত শিল্পের মধ্যে বয়নশিল্পের স্থান সর্বাগ্রে। এছাড়া নানা রকম ভারী ও হালকা যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, মোটর গাড়ি ও ট্রাক, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, আসবাব ইত্যাদি শিল্পাকারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। যানবাহনের ক্ষেত্রে মহানগরীর পাতাল রেল (মেট্রো) পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখানকার কয়েকটি রঙ্গমঞ্চ এবং যাদুঘর তুলনাহীন। সত্তর একর আয়তনবিশিষ্ট প্রাচীন ক্রেমলিন প্রাসাদ এবং তৎসন্নিহিত রেড স্কোয়ারে কাচের আধারে রক্ষিত লেনিনের মমি দেখতে দেশ-বিদেশের অগণিত লোকের ভীড় হয়ে থাকে।

ফ্রান্স

অবস্থান ও আয়তন: ফ্রান্স পশ্চিম ইউরোপের অন্তর্গত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ৪২°২০´ ও ৫১°৫´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮°১০´ ও ৫°৫৫´ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত এই দেশ তিনদিকে সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত। উত্তরে ইংলিশ চ্যানেল, পশ্চিমে বিস্কে উপসাগর এবং দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর দেশের সীমানাকে স্পষ্টভাবে নির্ধারিত করেছে। স্থল-সীমান্তের দক্ষিণ-পশ্চিমে স্পেন ও পূর্বে যথাক্রমে বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, পশ্চিম জার্মানি, সুইটজারল্যাণ্ড এবং ইটালি অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্বদিকে ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত কর্সিকা দ্বীপ ফ্রান্সের অন্তর্গত। এই দেশের মোট আয়তন ৫৫১,৬০১ ব কি (মানচিত্র ১০)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত অঙ্কিত একটি কাল্পনিক রেখার সাহায্যে দেশটিকে দুটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায়। এই রেখার পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চল নিম্ন সমভূমি ও মালভূমি এবং পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল প্রধানত পাহাড় ও পর্বতদ্বারা গঠিত। বস্তুত দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভূমি সমুদ্রাঙ্ক অপেক্ষা মাত্র ১০০ মি উঁচু এবং মোট ৬০ শতাংশ ভূমির উচ্চতা সমুদ্রাঙ্ক থেকে ২৫০ মি। কেবল ৭ শতাংশ ভূভাগের উচ্চতা ১০০০ মিটারের উর্ধ্বে।



মানচিত্র ১০

দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় স্পেনের সীমান্ত থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে বেলজিয়ামের সীমান্ত পর্যন্ত একটানা বিরাট পলিগঠিত সমভূমি অঞ্চল বিস্তৃত। স্থানে স্থানে ছোট ছোট নিচু পাহাড় ব্যতীত সমভূমির ভূপ্রকৃতি মূলত বৈশিষ্ট্যবিহীন। উত্তর-পশ্চিমে ব্রিটানী অন্তরীপের ভূপ্রকৃতি আগ্নেয়শিলার উপস্থিতির জন্য অপেক্ষাকৃত বন্ধুর। একমাত্র ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় সমভূমি ব্যতীত দক্ষিণ-পূর্বাংশের ভূভাগ সর্বত্র পাহাড় ও পর্বতদ্বারা গঠিত হওয়ার জন্য বন্ধুরতর। এই অঞ্চলের বিরাট অংশ জুড়ে সেন্ট্রাল মাসিফ (Central Massif) একটি কঠিন শিলাগঠিত উচ্চ মালভূমি। চারপাশে সমভূমিবেষ্টিত এই মালভূমির সর্বোচ্চ উচ্চতা ১৮৫৬ মিটারের উর্ধ্বে। দক্ষিণ-পশ্চিমে এই মালভূমি দ্রুত নেমে গিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলীয় সমভূমি ও রোন

উপত্যকার সঙ্গে মিশেছে। দক্ষিণে সংকীর্ণ কারকাসন সমভূমি সেন্ট্রাল মাসিফ মালভূমিকে পিরেনীজ পর্বত থেকে পৃথক করেছে। উত্তর-পূর্ব দিকে এই মালভূমি মরভানের পার্বত্য অঞ্চলের মাধ্যমে ভোজ পর্বত পর্যন্ত একটানা বিস্তৃত। শিলা-রাশির প্রকারভেদ অনুযায়ী ভূপ্রকৃতি কোথাও স্তূপসদৃশ মসৃণ, আবার কোথাও বা অতি বন্ধুর পাহাড়ের সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণে পিরেনীজ পর্বত এবং দক্ষিণ-পূর্বভাগে আল্পস পর্বতের প্রসার প্রকৃত পার্বত্যাঞ্চলের অন্তর্গত। পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রায় ৪২০ কি প্রসারিত পিরেনীজ একটি অবিচ্ছিন্ন সুউচ্চ প্রাচীরের ন্যায় অবস্থিত। এই পর্বতের কয়েকটি শৃঙ্গের উচ্চতা ৩০৫০ মিটারের উর্ধ্বে। ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল ও জেনিভা হ্রদের মধ্যবর্তী আল্পস পর্বত অর্ধবৃত্তাকারে কয়েকটি সমান্তরাল শাখায় প্রসারিত। পর্বতের মধ্য ও উত্তরভাগে প্রাচীন হিমবাহের নানা ক্ষয়কার্যের চিহ্ন দেখা যায়। আল্পসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মঁ ব্লাঁর (Mt. Blanc) উচ্চতা ৪৮০৭ মি। এই পর্বতের একটি শাখা জুরা পর্বত নামে রোন থেকে রাইন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত।

ফ্রান্সের প্রধান চারটি নদী সেন্ট্রাল মাসিফ ও তার উত্তর-পূর্বের অংশ থেকে উৎপন্ন। এদের মধ্যে সেন তার বিভিন্ন উপনদীসহ ইংলিশ চ্যানেলে পতিত হয়েছে। লয়ার এবং গেরোন পশ্চিম দিকে বিস্কে উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। মালভূমি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন সাওন কিছু দূর প্রবাহিত হবার পর আল্পস থেকে নির্গত রোনের সঙ্গে মিলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরে পড়েছে। মালভূমির অন্যান্য নদীর মধ্যে মিউজ ও মোজেল রাইনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রাইন দেশের পূর্ব সীমানা বরাবর কিছুদূর প্রবাহিত হবার পর পশ্চিম জার্মানিতে প্রবেশ করেছে।

অধিবাসী : ফ্রান্সের মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪৯,৮৫০,০০০। জনঘনত্বের বিচারে ফ্রান্স পশ্চিম ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। এখানকার প্রতি বর্গ কিলোমিটার ভূমিতে গড় ৯১ জন লোক বাস করে। প্রতিবেশী-রাজ্য হল্যাণ্ডে ৩৭০, বেলজিয়ামে ৩১৩, পশ্চিম জার্মানিতে ২৪০, যুক্তরাজ্যে ২২৪ এবং ইটালিতে ১৭৩ জন লোক দেখা যায়। দেশের মধ্যে জনঘনত্ব কোথাও বেশি, আবার কোথাও খুব কম। উত্তরাংশে প্যারিস থেকে আরম্ভ করে সেন নদীর মধ্য ও নিম্ন অববাহিকায় জনঘনত্ব সর্বাধিক। উপকূলীয় সমভূমি এবং প্যারিসের চার পাশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনঘনত্ব দুশর বেশি। এর পরেই মিউজ উপত্যকার স্থান। উত্তর-পশ্চিমাংশে এবং রোন উপত্যকাতেও জনঘনত্ব উল্লেখযোগ্য। দেশের বাকি অংশে লোকের সংখ্যা অনেক কম। সেন্ট্রাল মাসিফের বৃহৎ অংশে এবং পার্বত্যাঞ্চলে জনঘনত্ব ত্রিশের নিচে।

ফ্রান্সের অধিবাসীদের প্রায় ৩৬ শতাংশ গ্রামে বাস করে এবং ৬৪ শতাংশ শহর ও নগরের বাসিন্দা।

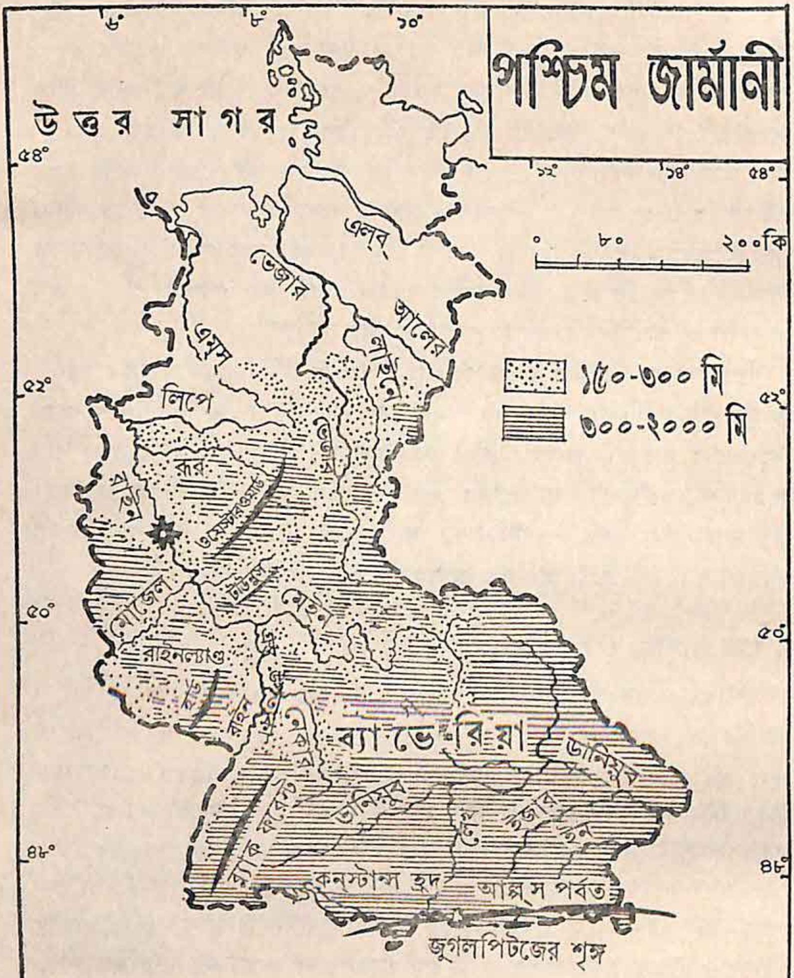
রাজধানী : প্যারিস (জনসংখ্যা : ৮,১৯৬,৭৪৬ : ১৯৬৮): সেন নদীর উভয় তীরে অবস্থিত প্যারিস ফ্রান্সের রাজধানী, রাজ্যের বৃহত্তম ও পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগর। রোমীয়দের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে 'প্যারিসি' নামক ধীবর সম্প্রদায় সেন নদীর মাঝখানে অবস্থিত দ্বীপে ছোট একটি বসতি প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে রোমীয়রা সে দ্বীপ দখল করে নেয় এবং ঐস্থানে নদীর উভয় তীরে শহর গড়তে থাকে। এইভাবে বর্তমান প্যারিসের জন্ম হয়। রোমীয় প্যারিসের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান। পরবর্তী দুহাজার বছর ধরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে প্যারিস তার অস্তিত্বকে বজায় রেখে এসেছে এবং বর্তমানে সমগ্র দেশের প্রাণকেন্দ্র ও পশ্চিমী সভ্যতার সংস্কৃতিকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশাসনিক কার্য ছাড়াও প্যারিসের মূল খ্যাতি শিক্ষা ও গবেষণায়, চিত্র, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ইত্যাদিতে, পোশাকের আধুনিকতম রূপবিন্যাসে এবং বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্বীকৃত। ফ্রান্সের প্রায় এক-চতুর্থাংশ শিল্প প্যারিস মহানগর ও তার আশেপাশে কেন্দ্রীভূত। জাতিপুঞ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয় এখানে অবস্থিত। এই মহানগরীর অজস্র দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে ল্যুভর চিত্রশালা, আইফেল টাওয়ার, নোত্‌রদাম গির্জা ইত্যাদি দেখার জন্য অজস্র বিদেশীর সমাগম হয়।

পশ্চিম জার্মানি

অবস্থান ও আয়তন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে জার্মানি দ্বিখণ্ডিত হয়ে পশ্চিম জার্মানি 'ফেডেরাল রিপাবলিক অব জার্মানি' (Federal Republic of Germany), এবং পূর্ব জার্মানি 'জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক' (German Democratic Republic) নামে দুটি পৃথক স্বাধীন রাজ্যের জন্ম হয়। চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব জার্মানির মধ্যভাগে অবস্থিত বার্লিন মহানগরীর পশ্চিমার্ধ পশ্চিম জার্মানিকে দেওয়া হয়। ৪৭°১৬´ ও ৫৫°০৩´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৫°৫৬´ ও ১৩°৫০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত পশ্চিম জার্মানি একমাত্র উত্তর প্রান্ত ব্যতীত অন্য দিকে ইউরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমাদ্বারা বেষ্টিত। উত্তরে উত্তর সাগর ও বল্টিক সাগর এবং ডেনমার্ক, পশ্চিমে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ ও ফ্রান্স ; দক্ষিণে সুইটজারল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়া ; পূর্বে অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া এবং পূর্ব জার্মানি। পশ্চিম বার্লিনসহ পশ্চিম জার্মানির মোট আয়তন ২৪৮,৪১৫ ব কি (মানচিত্র ১১)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী : ভূপ্রকৃতি অনুসারে পশ্চিম জার্মানিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা, (ক) দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল ; (খ) মধ্য মালভূমি অঞ্চল এবং (গ) উত্তরের সমভূমি অঞ্চল। দেশের দক্ষিণ সীমান্ত জুড়ে আল্পস পর্বত সুউচ্চ প্রাচীরের ন্যায় পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রসারিত। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জুগলপিটজের উচ্চতা ২৯৬২ মি। দক্ষিণ-পশ্চিমে কন্সটান্স হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত আল্পস পর্বত অত্যন্ত



মানচিত্র ১১

বন্ধুর ভূপ্রকৃতির সৃষ্টি করেছে। সীমান্তবর্তী আল্পসের প্রধান শাখা উত্তর ডানিয়ুব নদীর অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত আল্পীয় পুরোভাগ (alpine foreland) আন্দোলিত পর্যায়ের মালভূমি। পর্বত থেকে নির্গত অসংখ্য নদীদ্বারা এই মালভূমি ভীষণভাবে ব্যবচ্ছিদিত। আল্পীয় পুরোভাগের উত্তরে দেশের বিস্তৃততম অঞ্চল জুড়ে অত্যন্ত ভগ্ন প্রকৃতির অবক্ষয়িত মালভূমি অসংখ্য ছোট-বড় পাহাড় এবং অন্তর্বর্তী অবতলের

সৃষ্টি করেছে। এই মালভূমি মূলত আল্পস অপেক্ষা প্রাচীনতর পর্বতের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ, বর্তমানে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন উচ্চভূমি ও পাহাড়াঞ্চলের জন্ম দিয়েছে। সমগ্র ব্যাভেরিয়া ও রাইনল্যাণ্ড এবং পাহাড়ের মধ্যে হার্ড, ওয়েস্টারওয়ার্ড, টাউনুস ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দক্ষিণাংশে মালভূমি অঞ্চলের গড় উচ্চতা ৬০০-৯০০ মিটারের মত। উত্তরাংশে উচ্চতা অধিকাংশ স্থানে ৫০০ মিটারের নিচে নেমে এসেছে। আল্পস পর্বত উত্থানের সময় সংকোচনজনিত প্রচণ্ড আলোড়ন ঐ প্রাচীন কঠিন শিলাগঠিত উচ্চভূমির স্থানে স্থানে চ্যুতি বা ফাটলের সৃষ্টি করে এবং তার ফলে কোন কোন স্থান ভূগর্ভে বসে গিয়ে অবতল এবং প্রান্তবর্তী পাহাড়ের জন্ম দেয়। এই ধরনের চ্যুতির ফলে রাইন গ্রস্ত উপত্যকা ও তার দুই প্রান্তে ব্ল্যাক ফরেস্ট ও ভোজ পর্বতের (ফ্রান্স) সৃষ্টি হয়। প্রায় দুশ কিলোমিটার প্রশস্ত উত্তরের সমভূমির স্থানে স্থানে প্রাচীন হিমবাহের ক্ষয় এবং সঞ্চয়ক্রিয়ার চিহ্ন হিসাবে ছোট ছোট পাহাড়, হ্রদ এবং নিম্নভূমি দেখা যায়।

ডানিয়ুব ব্যতীত অন্যান্য প্রধান নদীগুলি উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে উত্তর সাগরে পড়েছে। রাইন দেশের দীর্ঘতম নদী, পশ্চিম জার্মানি ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়াতে আন্তর্জাতিক নদী বলা যেতে পারে। সুইটজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত আল্পস পর্বত থেকে উৎপন্ন রাইন ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানির সীমা বরাবর অগ্রসর হয়ে পশ্চিম জার্মানিতে প্রবেশ করেছে এবং সেখান থেকে হল্যাণ্ডের ভেতর দিয়ে উত্তর সাগরে গিয়ে পড়েছে। রাইনের উপনদীর মধ্যে পশ্চিমবাহিনী নেকার, মেইন, রূর ও লিপে এবং পূর্ববাহিনী মোজেল প্রধান। ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে উৎপন্ন ডানিয়ুব পূর্ব দিকে প্রবাহিত। ডানিয়ুবের প্রধান উপনদী লেখ, ইজার ও ইন আল্পসে জন্ম নিয়েছে। উত্তর সমভূমির প্রধান নদী এমস, ভেজার, এবং এল্‌ব বিরাট খাঁড়ি সৃষ্টি করে উত্তর সাগরে পতিত হয়েছে। নদীগুলি মধ্যভাগের মালভূমি অঞ্চলে উৎপন্ন। ভেজারের দুটি উপনদী লাইনে এবং এলের উল্লেখযোগ্য।

অধিবাসী: শিল্পোন্নত দেশ পশ্চিম জার্মানির লোকসংখ্যা ৫৯,৩০০,০০০। মোট অধিবাসীর ৭৫ শতাংশ শহর ও নগরে বাস করে এবং গ্রামে বসবাসকারী বাকি এক-চতুর্থাংশ কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল। দেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটার ভূমিতে গড় ২৪০ জন লোকের বাস হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ অঞ্চলে জনঘনত্ব অনেক কম। রাইনল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশে, রাইন গ্রস্ত উপত্যকা ও মালভূমি অঞ্চলে উচ্চফলনশীল নিবিড় ও মিশ্রচাষের দৌলতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১০০ জন লোক বাস করে। সে তুলনায় সমভূমি অঞ্চলের উত্তরাংশে ও নিম্নভূমিতে জনঘনত্ব মাত্র ১৯। মালভূমি অঞ্চলের নদী উপত্যকা ভিন্ন অন্যান্য স্থানে এবং দক্ষিণের পার্বত্যাঞ্চলে জনঘনত্ব অত্যন্ত নিম্নহারের।

রাজধানী: বন (জনসংখ্যা ২৭৫,৭২২ : ১৯৭০): ১৯৪৯ সালে পশ্চিম জার্মানি

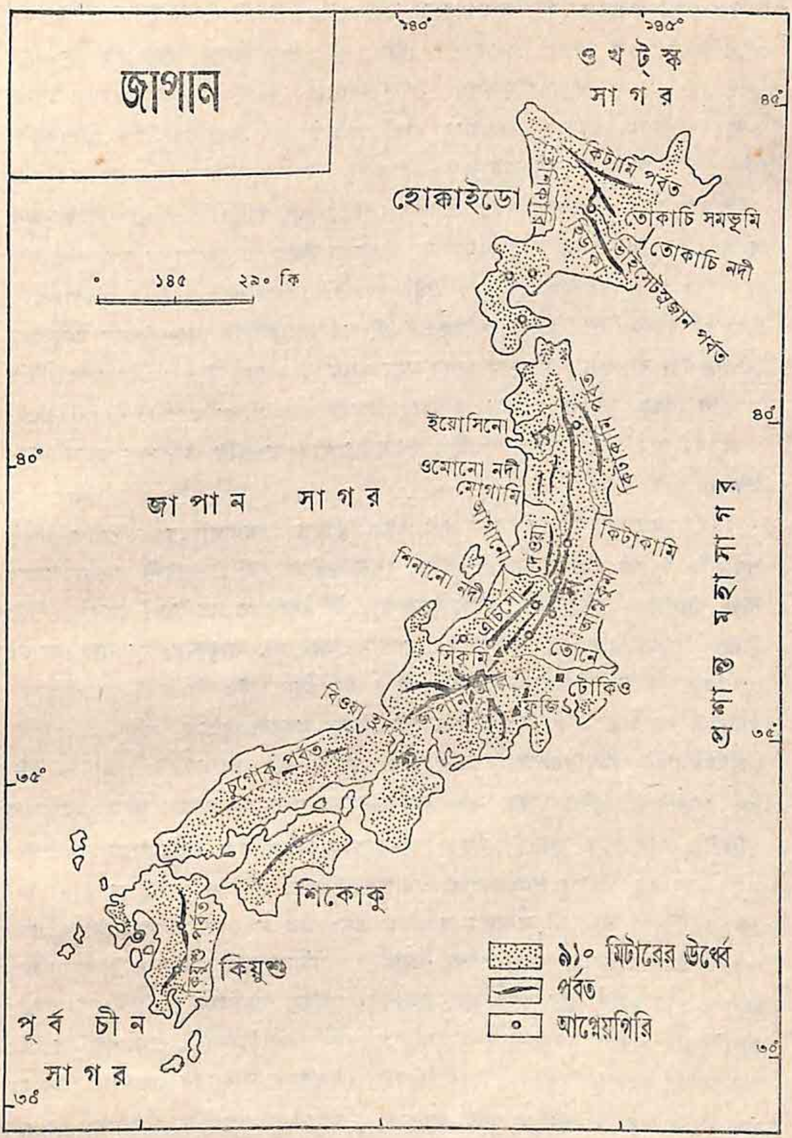
গঠনের পর নতুন রাজধানী বন নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। বন রাইন নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। খ্রীষ্টপূর্ব ১০ অব্দ নাগাদ, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দুহাজার বছর আগে রোমীয় শাসকেরা কাস্ট্রা বনেনশিয়া (Castra Bonnensia) নামক একটি ক্ষুদ্র সৈন্যাবাস স্থাপন করে। ঐ সৈন্যাবাস থেকে পরবর্তীকালে বন নগরের উৎপত্তি হয়।

প্রসাসনিক কেন্দ্র ব্যতীত বনের মূল খ্যাতি শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এবং তার পাঠাগার ও সংরক্ষণশালা জগদ্বিখ্যাত। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সুরকার বিটোভেন এই নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং অধিকাংশ জীবন এখানে অতিবাহিত করেন। বর্তমানে শিল্প-উৎপাদনে বন খ্যাতি অর্জন করেছে। প্রধান উৎপাদনের মধ্যে চীনামাটির বাসন, অফিসে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, পিয়ানো, চামড়ার জিনিস এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও বন পশ্চিম জার্মানির অন্যান্য অনেক নগর অপেক্ষা আয়তন এবং গুরুত্বে পিছিয়ে রয়েছে।

জাপান

অবস্থান ও আয়তন: এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত জাপান পূর্বপ্রান্তে ২৬°৫৯´ থেকে ৪৫°৩১´ উত্তর অক্ষাংশ ও ১২৮°০৬´ থেকে ১৪৫°৪৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জকে নিয়ে গঠিত। এই দ্বীপপুঞ্জ এশিয়ার মূলভূখণ্ড থেকে প্রায় ৩০০০ মি গভীর সমুদ্রদ্বারা বিচ্ছিন্ন। আন্তর্জাতিক নাম জাপান হলেও, স্বদেশীয়দের কাছে দেশটি 'নিপ্পন' বা 'নিহন' বলে পরিচিত। চারটি প্রধান দ্বীপ, হোক্কাইডো, হোনশু, কিয়ুশু ও শিকোকু ছাড়া আরও কয়েকটি ছোট দ্বীপ উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ২৪১৫ কি দীর্ঘ। সমুদ্রবেষ্টিত দেশটির পশ্চিমে জাপান সাগর, উত্তরে ওখটস্ক সাগর, দক্ষিণে পূর্ব চীন সাগর ও পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর। জাপানের অন্তর্গত স্থলভাগের মোট আয়তন ৩৬৯,৬৬০ ব কি (মানচিত্র ১২)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: জাপানের অধিকাংশ ভূভাগ পার্বত্য। দেশটির ভূপ্রাকৃতিক চেহারা অনেকটা একটি উল্টে-রাখা নৌকোর মত মাঝখান থেকে ধীরে ধীরে দুইপ্রান্তে ঢালু হয়ে গেছে। পর্বতগুলি অর্ধবৃত্তাকারে দ্বীপসমূহের মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। তার ফলে একমাত্র উপকূল অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোথাও সমতলভূমি নেই। হোক্কাইডো দ্বীপের উত্তরাংশে কিটামি পর্বত ও দক্ষিণাংশে হিডাকা পর্বত পরস্পর প্রসারিত হয়ে মধ্যভাগে ডাইসেটসুজান পর্বতে মিলিত হয়েছে। এই দ্বীপের পূর্বভাগে তোকাচি সমভূমি, পশ্চিমভাগে ইশিকারি উপত্যকা অবস্থিত। হোনশু দ্বীপের উত্তরাংশে আউ এবং এচিকো-দেওয়া পর্বতশ্রেণী পরস্পর সমান্তরালভাবে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। পর্বত দুটি ১৫২৫-২১৩৫ মি



মানচিত্র ১২

উঁচু এবং এদের শৃঙ্গদেশে অনেকগুলি শঙ্কু আকৃতি (cone-shaped) আগ্নেয়গিরি বর্তমান। দক্ষিণে অবস্থিত আসামা আগ্নেয়গিরির উচ্চতা প্রায় ১৮৩০ মি। আরও দক্ষিণে অবস্থিত জাপানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ফুজি (৩৭৭৭ মি) বর্তমানে একটি মৃত আগ্নেয়-

গিরি। অউ পর্বতের পূর্বদিকে যথাক্রমে কিটাকামি পর্বত ও আবুকুমা পর্বত উপকূল ঘেঁষে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত। হোনশু দ্বীপের মধ্যভাগে জাপান আল্পস্ নামে পর্বতশ্রেণী সর্বোচ্চ পার্বত্য ভূভাগের সৃষ্টি করেছে। এই পর্বতপুঞ্জের গড় উচ্চতা ৩০৫০ মিটারের ঊর্ধ্বে। আল্পসের একটি শাখার নাম মিকুমি পর্বত। দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণার্ধে পর্বতের প্রসার একই রকম দেখা যায়। হোনশু দ্বীপের দক্ষিণভাগে চুগোকু পর্বত অবস্থিত। শিকোকু পর্বত ও কিয়ুশু পর্বতমালা যথাক্রমে ঐ দুই দ্বীপের প্রায় সমগ্র ভূভাগ জুড়ে বিস্তৃত। জাপানের পর্বতসমূহ উচ্চতায় হিমালয়ের মত না হলেও, অসাধারণ ক্ষয়জনিত বন্ধুরতা এবং প্রায় পঞ্চাশটি আগ্নেয়গিরির উপস্থিতি পর্বতাঞ্চলকে অন্য ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। এই সব আগ্নেয়গিরি থেকে বছরে গড়ে প্রায় ১৫০০ বার মৃদু থেকে প্রবল ভূকম্পন হয়ে থাকে। হোনশু দ্বীপের দক্ষিণাংশে চ্যুতির মাধ্যমে বিওয়া হ্রদ এবং আরও দক্ষিণে বিরাট অন্তর্বর্তী সমুদ্রের (Inland Sea) জন্ম হয়েছে। দ্বীপসমূহের উপকূল ঘিরে সংকীর্ণ সমভূমি অঞ্চলের স্থানে স্থানে জলাশয় দেখা যায়।

অনতিপ্রশস্ত এই দেশের কোন নদী খুব দীর্ঘ নয়। মধ্যভাগের পর্বতমালা থেকে নদীগুলি উৎপন্ন হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ববাহিনী বা পশ্চিমবাহিনী ধারায় সাগরে গিয়ে পড়েছে। হোক্কাইডো দ্বীপে তোকাচি, ইশিকারি ও তেসিও; হোনশু দ্বীপে ইয়োনোসিরো, ওমোনো, কিটাকামি, সোগামি, আগানো, আবুকুমা, সিনানো, তোনে, তেনরিয়ু, কিসো, ইয়োদো; শিককু দ্বীপে ইয়োসিনো ইত্যাদি নদী উল্লেখযোগ্য। নদীগুলি খরস্রোতা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ সাহায্য করে।

অধিবাসী: জাপানের মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দশ কোটি। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটার ভূমিতে প্রায় ২৭১ জন লোকের বাস জনঘনত্বের ক্ষেত্রে জাপানকে পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থান দিয়েছে। জনঘনত্বের ভৌগোলিক বন্টন অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। হোনশু দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কান্টো, নবি ও সেৎসু সমভূমি এবং কিয়ুশু দ্বীপের অন্তর্বর্তী সমুদ্রের সন্নিহিত উপকূলীয় সমভূমি সম্মিলিতভাবে সমগ্র দেশের প্রায় অর্ধেক লোককে আশ্রয় দিয়েছে। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটার ভূমিতে গড় ১০৬০০ লোক বাস করে এবং জাপানের বৃহত্তম নগরসমূহ ও শিল্প এই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। দেশের অন্যান্য স্থানে নদী-উপত্যকা এবং নিম্নভূমিতে যথেষ্ট সংখ্যক লোকবসতি গড়ে উঠেছে। কৃষিযোগ্য ভূমির অভাব হোক্কাইডোর মত শীতল স্থানেও সমভূমি অঞ্চলে ঘন বসতির সৃষ্টি করেছে। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০ জন অধিবাসী দেখা যায়। বন্ধুর ভূপ্রকৃতি, অনুর্বর মৃত্তিকা এবং প্রতিকূল জলবায়ু পর্বতাঞ্চলকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনুষ্য বসবাসের অনুপযুক্ত করে তুলেছে। প্রধানত পশুচারণের মাধ্যমে এই সব অঞ্চলে লোকে জীবিকা নির্বাহ করে। তা সত্ত্বেও অনেক স্থান সম্পূর্ণভাবে জনশূন্য।

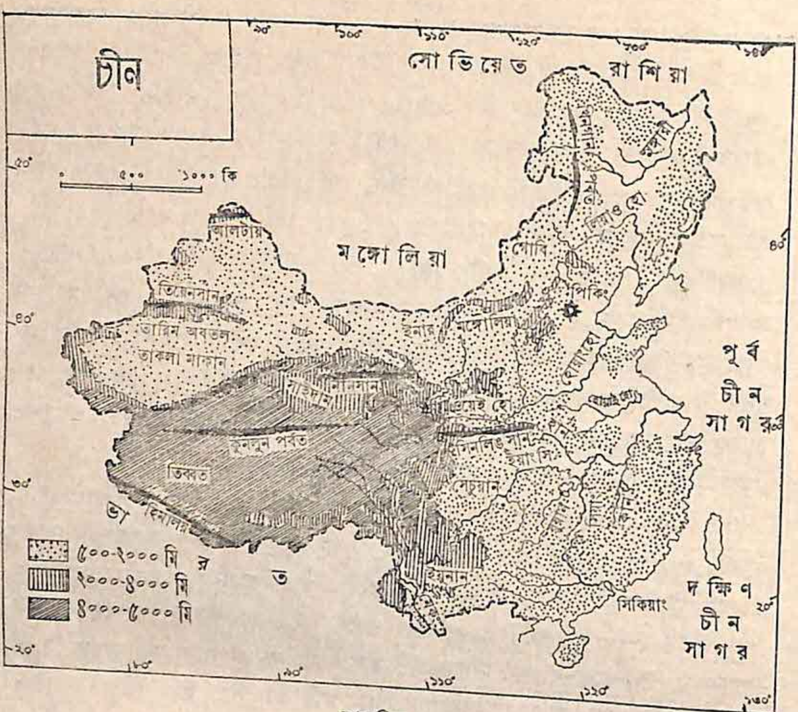
রাজধানী : টোকিও (জনসংখ্যা ৮,৮৪১,০০০ : ১৯৭০) : হোনশু দ্বীপের পূর্বপ্রান্তে টোকিও উপসাগরের তীরে, কাণ্টো সমভূমিতে অবস্থিত টোকিও জাপানের রাজধানী এবং পৃথিবীর বৃহত্তম মহানগর। ১৯৭০ সালে টোকিওর জনসংখ্যা ছিল নব্বই লক্ষের কাছাকাছি। বর্তমানে তা এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। দেশের মোট অধিবাসী-দের প্রায় ১০ শতাংশ এই মহানগরীতে বাস করে। এই মহানগর জাপানের প্রধান রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং শিল্পকেন্দ্র।

টোকিওর ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে এডো নামে পরিচিত এই স্থানটিতে প্রথম তৎকালীন সামরিক শাসকের 'পূর্ব রাজধানী' অথবা জাপানী ভাষায় 'টোকিও' স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে দেশের মূল রাজধানী ছিল পশ্চিমে অবস্থিত নগর কিয়োটোতে। পরবর্তী ২৬৫ বছরের মধ্যে এডো দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপান সাম্রাজ্যের রাজধানী ঐ স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ঐ সময় থেকে এডোর পরিবর্তে টোকিও নাম ব্যবহৃত হতে থাকে।

শিল্প এবং সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র টোকিওর বিশ্ববিদ্যালয়, অজস্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জাতীয় গ্রন্থাগার, যাদুঘর এবং মঞ্চ সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শিল্পের ক্ষেত্রেও টোকিওর অগ্রগতি বিস্ময়কর। লৌহ ও ইস্পাতনির্ভর শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, মুদ্রণ শিল্প, সূক্ষ্মযন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত কাচ শিল্প, নানা রকম ভোজ্যবস্তু ইত্যাদি শিল্পাকারে উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়েছে। মহানগরের যানবাহন ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত মানের। টোকিওর প্রধান রেলস্টেশন দিয়ে প্রতিদিন দশ লক্ষ লোক যাতায়াত করে। এছাড়া বন্দর হিসেবেও মহানগরের আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। তিনদিকে পাহাড় এবং একদিকে সমুদ্রবেষ্টিত টোকিওর প্রাকৃতিক পরিবেশ তুলনাহীন। অনতিদূরে ফুজিয়ামার তুষারধবল শৃঙ্গ দর্শনের জন্য অজস্র বিদেশীর আগমন ঘটে থাকে।

চীন

অবস্থান ও আয়তন : এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের পর্বাংশে ২১°০৯´ ও ৫৩°৫৪´ অক্ষাংশ এবং ৭৩°৩৭´ ও ১৩৫°০৫´ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে চীনের অবস্থান রাজনৈতিক বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার অনেকগুলি রাষ্ট্র চীনের চারপাশ ঘিরে রয়েছে। উত্তরে মঙ্গোলিয়া, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে সোভিয়েত রাশিয়া, পশ্চিমে আফগানিস্তানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ, দক্ষিণে ভারত, নেপাল, ভুটান, ব্রহ্মদেশ, লাওস ও ভিয়েৎনাম এবং পূর্বে কোরিয়া চীনের আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ করেছে। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্বে ভূভাগের সংলগ্ন ইংরেজ উপনিবেশ হংকং, অনতিদূরে তাইওয়ান এবং উত্তর-পূর্বদিকে জাপান দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান দেশের সীমানাকে উন্মুক্ত হবার অবকাশ দেয়নি। আয়তনে চীন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা বৃহত্তর এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পরেই



মানচিত্র ১৩

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। চীনের বর্তমান আয়তন ৯,৫৯৭,০০০ ব কি। (মানচিত্র ১৩)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী : চীনের ভূপ্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে দেশটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন, পূর্ব-উপকূল সন্নিহিত পলি-গঠিত নিম্নভূমি; দক্ষিণাংশের মধ্যভাগে ইয়াংসি উপত্যকার অন্তর্বর্তী বৃহদায়তন হ্রদীয় অবতল; দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চল; পশ্চিমাংশের অত্যুচ্চ মালভূমিসমূহ; উত্তরাংশের মধ্যভাগে অসংখ্য নিচু এবং অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি। নিম্নভূমি এবং হ্রদীয় অবতল সম্মিলিতভাবে সমগ্র দেশের মাত্র ১৫ শতাংশ ভূভাগ গঠন করেছে। সেই তুলনায় বাকি প্রায় ৮৫ শতাংশ ভূভাগ পর্বত বা মালভূমি দ্বারা গঠিত।

পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম চীন প্রধানত কয়েকটি মালভূমির সমন্বয়ে গঠিত। দক্ষিণ থেকে উত্তর ও উত্তর-পূর্বদিকে মালভূমিগুলি ধাপে ধাপে নেমে গেছে। প্রতিটি মাল-ভূমি সুউচ্চ পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। প্রায় ৩৬৬° মি উচুঁ তিব্বত মালভূমি দক্ষিণে হিমালয়, পশ্চিমে হিন্দুকুশ-কারাকোরাম, উত্তরে কুনলুন-অল্টিন তাগ এবং পূর্বে

সিনকিয়াঙের অন্তর্গত উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত পর্বতশ্রেণী দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বেষ্টিত। সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, মেকং, ইয়াংসি এবং হোয়াংহো তিব্বত মালভূমি থেকে উৎপন্ন। পশ্চিমে পামির গ্রন্থি থেকে বেরিয়ে কুনলুন পর্বত সিনলিঙসান নামে পূর্বদিকে প্রসারিত। কুনলুনের গড় উচ্চতা প্রায় ৬০৯৫ মি। তিব্বত মালভূমির উত্তর-পূর্বে এবং কুনলুনের উত্তরে সাইদাম মালভূমি (২১৩৫-৩০৫০ মি) উত্তর-পশ্চিমে অল্টিন তাগ, উত্তর-পূর্বে নানসান এবং দক্ষিণে কুনলুন পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। এটি একটি অন্তর্বাহিনী নদী এলাকা। তিব্বত মালভূমির উত্তরে তারিম অবতল (৯০০-১৫২৫ মি) তিনদিকে পর্বত প্রাকার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত। দক্ষিণে অল্টিন তাগ, পশ্চিমে পামির গ্রন্থি এবং উত্তরে তিয়েনসান পর্বত। এই সমস্ত অত্যুচ্চ পর্বত থেকে অসংখ্য হিমবাহ-পুষ্ট নদী তারিম অবতলে নেমে এসেছে। কিন্তু কিছুদূর প্রবাহিত হবার পর সব নদী অন্তহীন বালুকায় হারিয়ে গেছে। তারিম অবতলের মধ্যভাগে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ মরুভূমি তাকলামাকান অবস্থিত। তিয়েনসান ও উত্তরে আলটায় পর্বতের মধ্যবর্তী অংশ জুঙ্গেরিয়ান অবতল নামে খ্যাত। পশ্চিমে নানাসান পর্বত ও পূর্বে খিনগান পর্বতের মধ্যবর্তী মালভূমি ইনার মঙ্গোলিয়া (৯১৫-১৮৩০ মি) নামে পরিচিত। ইনার মঙ্গোলিয়া প্রকৃত অর্থে গোবি মরুভূমির দক্ষিণার্ধ। খিনগান পর্বত অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মালভূমির আকার ধারণ করেছে এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩২০° কি বিস্তৃত। চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ মূলত ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি। এখানকার কেইচো মালভূমি ১২২০ মি এবং ইয়ুনান মালভূমি ১৮৩০ মি উঁচু। ইয়াংসি ও সিকিয়াং নদীর মধ্যবর্তী চীনের দক্ষিণ-পূর্বাংশ অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট পর্বতমালা ও পাহাড়ের সমন্বয়ে গঠিত।

চীনের সমভূমি অঞ্চলসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে উপকূল এবং নদী উপত্যকায় দেখা যায়। উত্তর-পূর্বে মাঞ্চুরিয়া সমভূমি পর্বত দ্বারা প্রায় বেষ্টিত। হোয়াংহোর নিম্ন অববাহিকা ও বদ্বীপাঞ্চলকে কেন্দ্র করে সর্ববৃহৎ সমভূমি অঞ্চল গড়ে উঠেছে। এই সমভূমি দক্ষিণে ইয়াংসি নদীর বদ্বীপাঞ্চল পর্যন্ত একটানা প্রসারিত। ইয়াংসি নদীর মধ্যগতিতে কয়েকটি বৃহৎ হ্রদ ও সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে। সিকিয়াং নদীর মধ্য-গতিতেও অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সমভূমি এবং নিম্নগতিতে বিস্তৃততর বদ্বীপের গঠন উল্লেখযোগ্য।

চীনের প্রধান নদীগুলি পশ্চিমে অবস্থিত উত্তুঙ্গ তিব্বত মালভূমি থেকে উৎপন্ন। দেশের মধ্যভাগ দিয়ে পূর্ববাহিনী ইয়াংসি দীর্ঘতম নদী। কুনলুন পর্বতের দক্ষিণ-ঢাল থেকে জন্মলাভ করে ৫৪৭২ কি প্রবাহিত হবার পর ইয়াংসি পূর্ব চীন সাগরে গিয়ে পড়েছে। ইয়াংসির প্রধান উপনদী হান, য়ুয়ান, সিয়াং এবং কান। য়ুয়ান ও কানের গতিপথে দুটি বৃহৎ হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর চীনের হোয়াংহো দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী (৪৪৪২ কি)। পূর্ববাহিনী হোয়াংহো পীত সাগরে পড়েছে। অনবরত

বিধ্বংসী বন্যার জন্য হোয়াংহোকে পূর্বে 'চীনের দুঃখ' বলা হত। বর্তমানে একটি বৃহৎ প্রকল্পের মাধ্যমে এই নদীর ওপর কুড়িটি বাঁধ নির্মাণ করে বন্যা প্রশমিত হয়েছে এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও জমিতে সেচের কার্যে ঐ জল ব্যবহৃত হচ্ছে। হোয়াংহোর প্রধান উপনদী ওয়েই হো। দক্ষিণ চীনের সর্ববৃহৎ নদী সিকিয়াংও পূর্ববাহিনী। অন্যান্য নদীর মধ্যে দক্ষিণে সালউইন এবং মেকং তিব্বতের মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে চীন ভূখণ্ডের ওপর কিছু পথ দক্ষিণবাহিনী হয়ে প্রবাহিত হবার পর যথাক্রমে ব্রহ্মদেশ ও লাওসে প্রবেশ করেছে। সংহো ইয়ুনান মালভূমিতে উৎপন্ন হয়ে শেষ পর্যন্ত উত্তর ভিয়েৎনামে প্রবেশ করেছে। চীনের উত্তরাংশে হোয়াই হো, হাই হো, লিয়াও হো এবং ইয়ালু ও সুঙ্গারি নদী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অধিবাসী: চীন পৃথিবীর বৃহত্তম জনবহুল দেশ। বর্তমানে চীনের জনসংখ্যা ৭৮৭,১৭৬,০০০। অধিবাসীদের প্রায় ৭৫ শতাংশ পূর্বাংশের উপকূলীয় নিম্নভূমি ও সন্নিহিত পাহাড়াঞ্চল এবং মধ্যভাগের সেচুয়ান অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। ইয়াংসি নদীর মধ্য ও নিম্নভাগে জনঘনত্ব সর্বাধিক। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড় ৩৮৬—৪৬৩ জন লোক বাস করে থাকে যদিও অনেক স্থানে জনঘনত্ব ৭৭২—৯৬৫ পর্যন্ত দেখা যায়। পূর্ব উপকূলের দক্ষিণাংশে এই ধরনের জনঘনত্ব লক্ষ করার মত। উত্তরাংশের সমভূমি অঞ্চলে সমগ্র দেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ লোকের বাস। এখানকার গড় জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ২৫১। নিম্নভূমি অঞ্চলের বাইরে একমাত্র সেচুয়ান অঞ্চলে এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় জনঘনত্ব উচ্চমানের। সেচুয়ানে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ১৯৩ এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়াতে ১৩৫ জন অধিবাসী দেখা যায়। দেশের বাকি অংশ অতি বন্ধুর ভূপ্রকৃতি ও প্রতিকূল জলবায়ুর জন্য অত্যন্ত জনবিরল এবং অনেক স্থান জনমানবশূন্য।

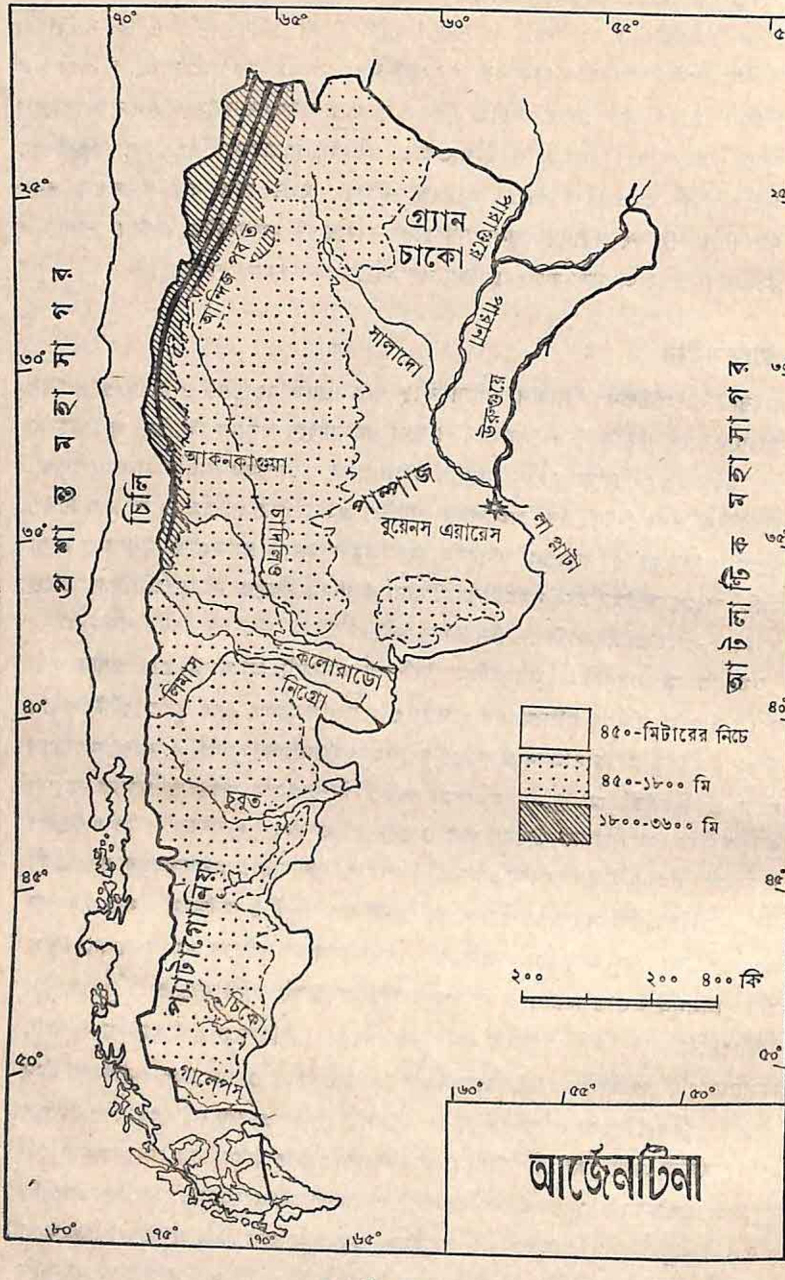
রাজধানী: পিকিং (জনসংখ্যা ৭,৫৭০,০০০ : ১৯৭১) : উত্তর চীন সমভূমিতে, সমুদ্র উপকূল থেকে মাত্র ১৬০ কি পশ্চিমে পাই ও ইয়াঙটিঙ্ নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত পিকিং চীনের রাজধানী এবং দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম মহানগর। প্রায় দুহাজার বছর আগে এই নগরীর জন্ম হয় এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সময় থেকে দেশের রাজধানী হিসেবে মর্যাদা পেয়ে এসেছে। বিংশ শতাব্দীতে পিকিং রেলপথের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। চীনে নতুন কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হবার পরই রাজধানী এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মহানগর দুটি প্রাকারবেষ্টিত প্রধান অংশে বিভক্ত: উত্তরাংশ 'ইনার সিটি' (Inner City) বা অন্তর্বর্তী নগর নামে পরিচিত। দক্ষিণের বৃহত্তম অংশকে বহির্প্রান্তীয় নগর বা আউটার সিটি (Outer City) বলা হয়। ইনার সিটির মধ্যভাগে প্রাচীন সম্রাটের বিরাট প্রাসাদ বর্তমানে নতুন সরকারের প্রধান কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূলকেন্দ্র পিকিং শিক্ষা ও

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমগ্র দেশের আদর্শস্বরূপ। এখানে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়, অজস্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ইত্যাদি শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় নবীন ও প্রাচীনকালের সমন্বয় সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সাম্প্রতিক কালে পিকিং-এ শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে এবং তার ফলে জনসংখ্যার সঙ্গে নগরের আয়তন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্যাদি, নানারকম যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কৃষিখামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, সূতীবস্ত্র, চামড়া, কাচ, ভোজ্যবস্তু উৎপাদন এবং মুদ্রণশিল্পে পিকিং বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। মহানগরীর প্রাচীন প্রাসাদের গঠনশৈলী এবং অন্যান্য অজস্র দ্রস্টব্য বস্তু পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ।

আর্জেনটিনা

অবস্থান ও আয়তন: দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণভাগে ২১°৪৭′ ও ৫৫°০৩′ দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ৫৩°৪০′ ও ৭৩°৩০′ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত আর্জেনটিনা এই মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। 'আর্জেনটিনা' নামের অর্থ 'রৌপ্যের দেশ'। তিনদিকে স্থলবেষ্টিত এবং মহাসাগর বেষ্টিত এই দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণে চিলি, উত্তরে বলিভিয়া ও পারাগুয়ে এবং পূর্বের কিছুটা অংশে ব্রাজিল ও উরুগুয়ে ছাড়া বাকি অংশে আটলান্টিক মহাসাগর সীমানা নির্ধারণ করেছে। আর্জেনটিনার মোট আয়তন ২,৭৭৭,৮১৫ ব কি। (মানচিত্র ১৪)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আর্জেনটিনাকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, পশ্চিমার্ধের পার্বত্য ও মালভূমি অঞ্চল এবং পূর্বার্ধের নিম্নভূমি অঞ্চল। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত আন্দিজ পর্বতমালার সুউচ্চ, পরস্পর সমান্তরাল শাখা ও অন্তর্বর্তী মালভূমির সমন্বয়ে গঠিত পশ্চিমার্ধের ভূপ্রকৃতি অত্যন্ত বন্ধুর। পশ্চিমদিকে পর্বতমালার উচ্চতা প্রায় ৫৭৯০-৬১০০ মি। পূর্বদিকে পর্বতের উচ্চতা কমে প্রায় ৪০০০ মিটারে নেমে এসেছে। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট আকনকাগুয়া ৬৯৬০ মি উঁচু। পর্বতশ্রেণীর মাঝে মাঝে অসংখ্য শুষ্ক বালুকাপূর্ণ ও কর্দমময় অথবা লবণাক্ত অবতল এবং শঙ্কু আকৃতি আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। পর্বতের শাখা-প্রশাখাবেষ্টিত মালভূমিসমূহ অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অবক্ষয়িত সমতলের সৃষ্টি করেছে। কলোরাডো নদী থেকে দেশের দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ কি বিস্তৃত পাটাগোনিয়া মালভূমি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই মালভূমির গড় উচ্চতা ৬১০ মি এবং পূর্বদিকে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে উপকূলভাগে প্রায় ৬০ মিটারে নেমে এসেছে। এখানকার অত্যন্ত শুষ্ক, শীতল এবং প্রায় গ্রীষ্মবিহীন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রকৃতি মনুষ্য বসবাসের অনুপযুক্ত। আন্দিজ পর্বতমালা ও মালভূমি অঞ্চলের পূর্বদিকে আর্জেনটিনার বিখ্যাত সমভূমি অঞ্চল উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত। সমভূমির উত্তরাংশ গ্রান চাকো এবং দক্ষিণাংশ পাম্পা নামে পরিচিত। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আন্দিজ ও সন্নিহিত উচ্চ মালভূমি



আর্জেনটিনা
প্রশান্ত মহাসাগর
আটলান্টিক মহাসাগর
চিলি
গ্র্যান চাকো
আন্দিজ পর্বত
আকনকাগুয়া
সালাদো
পাম্পাজ
বুয়েনস এয়ারেস
কলোরাডো
নিগ্রো
চুবুত
প্যাটাগোনিয়া
গালেগস
৪৫০-মিটারের নিচে
৪৫০-১৮০০ মি
১৮০০-৩৬০০ মি
২০০
২০০ ৪০০ কি

মানচিত্র ১৪

অঞ্চলের নদীবাহিত ক্ষয়িত পদার্থ জমা হয়ে এই বিস্তীর্ণ নিম্ন সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে স্থানে স্থানে প্রায় ৮০০ কি প্রশস্ত এই সমভূমির ভূভাগ সর্বত্র সমতল। ঢালের অভাবে কোথাও কোথাও বিরাটাকৃতি জলাভূমি দেখা দিয়েছে। চাকো অঞ্চলের উত্তরভাগে এবং পাম্পার উত্তর-পশ্চিমাংশে এই ধরনের জলাভূমি আছে।

উত্তর-পূর্বাংশের প্রধান নদী উরুগুয়ে, পারানা এবং পারাগুয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। উরুগুয়ে উপকূলের কাছে পারানার সঙ্গে মিশেছে এবং পারাগুয়ে দেশের উত্তর সীমানায় পারানার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই সম্মিলিত প্রবাহ লা প্লাটা নাম নিয়ে বিরাট খাঁড়ির সৃষ্টি করে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে। পারানার প্রধান উপনদীর মধ্যে আন্দিজ থেকে উৎপন্ন সালাডো এবং কুরাটো প্রধান। দক্ষিণার্ধের নদীগুলি আন্দিজ থেকে জন্মলাভ করে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে আটলান্টিকে পতিত হয়েছে। তার মধ্যে কলোরাডো ও তার প্রধান উপনদী চাডিলিও, নিগ্রো ও তার প্রধান উপনদী লিমাস এবং নিউ কোয়েন, চুবুত, চিকো, কয়লি এবং গালেগস বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

অধিবাসী: আর্জেনটিনার মোট অধিবাসীর সংখ্যা ২৩,৫৩৯,০০০। আয়তনের তুলনায় এই দেশের লোকসংখ্যা খুবই নগন্য। বস্তুতপক্ষে আর্জেনটিনার প্রতি বর্গ কিলোমিটার ভূমিতে মাত্র ৮'৩ জন লোক বাস করে। বন্ধুর ভূপ্রকৃতি এবং অনুদার জলবায়ুর জন্য দেশের বৃহত্তম অংশ বসবাসের উপযুক্ত নয়। একমাত্র নিম্ন সমভূমি-তে চাষবাস ও পশুপালন সম্ভব। এই কারণে পাম্পার পূর্বাংশ আয়তনে দেশের মোট ভূভাগের এক-পঞ্চমাংশ হলেও এখানে দুই-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে এবং মোট উৎপাদনের আশি শতাংশ জুগিয়ে থাকে। অধিবাসীর সংখ্যা এত কম হবার দ্বিতীয় কারণ হল ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনীয়দের আগমনের পর থেকে দেশটির প্রকৃত আর্থিক উন্নতি শুরু হয়। বর্তমানে ৯৯ শতাংশ অধিবাসী স্পেনীয় ও ইতালীয় বংশোদ্ভূত এবং মাত্র এক শতাংশ আদিবাসী। আদিবাসীরা প্রধানত আন্দিজ পর্বতাঞ্চলে বাস করে থাকে।

অধিবাসীদের প্রায় ৭০ শতাংশ শহর ও নগরের বাসিন্দা।

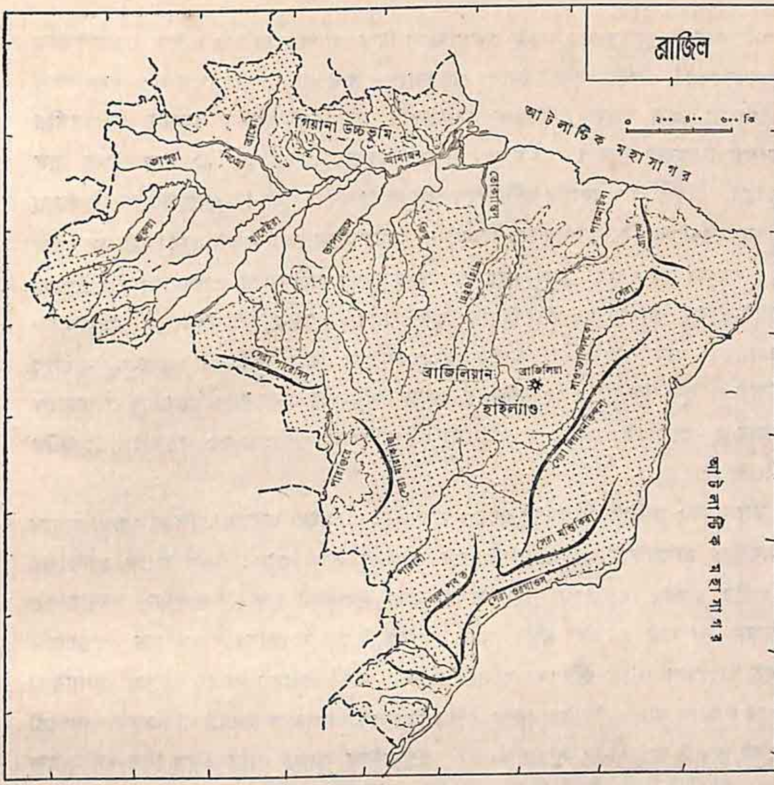
রাজধানী: **বুয়েনস এয়ারিস** (জনসংখ্যা: ২,৯৭২,০০০: ১৯৭০): লা প্লাটা খাঁড়ির মুখে এবং উপকূল থেকে ২৭৭ কি অভ্যন্তরে অবস্থিত বুয়েনস এয়ারিস আর্জেনটিনার রাজধানী এবং বৃহত্তম নগর। বুয়েনস এয়ারিসের লোকসংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ, অর্থাৎ দেশের প্রায় ৩০ শতাংশ অধিবাসী এই মহানগরী ও তার আশেপাশে কেন্দ্রীভূত। সেই বিচারে বুয়েনস এয়ারিস দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম মহানগর। স্পেনীয়রা ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরের পাকাপাকি পত্তন এবং 'বুয়েনস এয়ারিস' যার অর্থ 'সুবাতাস' তাদের দেওয়া নাম। উনবিংশ শতাব্দীতে এই নগরের

দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। অসংখ্য স্পেনীয়, ইতালীয়, আরব ও ইহুদী আগন্তুকদের সমবেত প্রচেষ্টায় অনতিকালের মধ্যে এই স্থানটি সড়ক রেলপথ, সমুদ্রপথ এবং শিল্প ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে যার ফলে এক শতাব্দীর মধ্যে নগরীর লোকসংখ্যা পঞ্চাশ গুণ বেড়ে যায়। বন্দর হিসেবে এই মহানগরীর স্থান নিউইয়র্কের ঠিক পরেই। সমগ্র দেশের আমদানী ও রপ্তানী এই বন্দরের মারফৎ হয়ে থাকে। আর্জেনটিনার বিপুল ঐশ্বর্য গম, মাংস এবং পশম বন্দরের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যুয়েনস এয়ারিসের স্থান সর্বাগ্রে। সঙ্গীত, নাটক, গ্রন্থশালা ও অতি আধুনিক শিক্ষালয়ের ব্যাপক প্রসার লক্ষ করার মত।

ব্রাজিল

অবস্থান ও আয়তন: দক্ষিণ গোলার্ধের বৃহত্তম দেশ ব্রাজিল দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্বাংশ জুড়ে ৫°১৬´ উত্তর ও ৩৩°৪৫´ দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ৩৪°৪৫´ ও ৭৪°০৩´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ব্রাজিল পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম দেশ। এই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিলি এবং ইকুয়েডর ব্যতীত দক্ষিণ আমেরিকার বাকি প্রত্যেকটি রাজ্য ব্রাজিলের সীমানায় অবস্থিত। উত্তরের কিছু অংশ থেকে আরম্ভ করে সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমানা বরাবর যথাক্রমে ফরাসী গিয়ানা, সুরিনাম, গায়েনা, জেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, পেরু, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, আর্জেনটিনা ও উরুগুয়ে ব্রাজিলের প্রতিবেশী রাজ্য। উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূল ৭২৪৫ কি দীর্ঘ। পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় ৩৭০০ কি প্রশস্ত এই রাজ্যের মোট আয়তন ৮,৫১১,৯৬৫ ব কি (মানচিত্র ১৫)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী: সমগ্র দেশের ৬০ শতাংশ জুড়ে 'ব্রাজিলিয়ান হাইল্যাণ্ড' নামে পরিচিত বিরাট মধ্য-মালভূমি পূর্ব উপকূল থেকে আমাজন অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। দীর্ঘকাল ক্ষয়ের ফলে মালভূমির বিভিন্ন অংশ সমোন্নতিবিশিষ্ট ভূভাগে পরিণত হয়েছে। পূর্বদিকে উপকূলভাগে এবং উপকূলের নিকটবর্তী অঞ্চলে উচ্চভূমি কয়েকটি পরস্পর সমান্তরাল, উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত পর্বতশ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। এই পর্বতগুলির পূর্ব-ঢাল অত্যন্ত খাড়া। পূর্ব থেকে পশ্চিমে সেরা মারাকাজু, সেরা গেরল, সেরা ওরগাওস, সেরা গ্রান্দে, সেরা দু মন্তিকুইরা পর্বত হিসেবে উল্লেখযোগ্য। রিও ডি জেনিরোর নিকটে পর্বতের উচ্চতা সর্বাধিক (২৮৮৪ মি)। দেশের উত্তর সীমানায় 'গিয়ানা উচ্চভূমি' মধ্য-মালভূমির ন্যায় আর একটি অবক্ষয়িত মালভূমি। দেশের অবশিষ্ট ভূভাগ আমাজন অববাহিকার অন্তর্গত। প্রায় ৩১ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট এই নিম্নভূমির অধিকাংশ স্থান সমুদ্রাঙ্ক থেকে মাত্র ১৫০ মি উঁচু বলে বর্ষাকালে প্লাবিত হয়। এই নিম্নভূমি পৃথিবীর গভীরতম অরণ্যের জন্ম দিয়েছে।



মানচিত্র ১৫

পেরুর অন্তর্গত আন্দিজ পর্বত থেকে মোরানন নাম নিয়ে জন্মলাভ করে আমাজন ব্রাজিলে প্রবেশ করেছে এবং পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে বিরাট খাঁড়ির মধ্য দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হয়েছে। জলবহনের ক্ষমতায় আমাজন পৃথিবীর বৃহত্তম নদী এবং দৈর্ঘ্যে দ্বিতীয় (৫৬৪০ কি)। নদীখাত নিম্নগতিতে প্রায় ৬৪ কি প্রশস্ত এবং নদীমুখে তা ৩৩৩ কি। বর্ষাকালে নদীর দুই প্রান্তে ৩২ কি ভূমি প্লাবিত হয়। আমাজন নদীমুখ থেকে পেরুর ইকুইটস পর্যন্ত নাব্য। আমাজনের অসংখ্য উপনদীর মধ্যে উত্তরবাহিনী জুরুয়া, পুরুস, মাদেইরা, তাপাজস, জিঙ্গু ও তোকান্তিস, আরাগুইয়া এবং দক্ষিণবাহিনী জাপুরা ও নিগ্রো-ব্রাঙ্কো প্রধান। অন্যান্য নদীর মধ্যে পারানা এবং পারাগুয়ে ব্রাজিলিয়ান হাইল্যাণ্ড থেকে নির্গত হয়ে দক্ষিণাভিমুখে কিছু-দূর প্রবাহিত হবার পর প্রতিবেশী রাজ্যে প্রবেশ করেছে। সাও ফ্রান্সিসকো এবং পারনাইবা নদী দক্ষিণবাহিনী অবস্থায় যথাক্রমে পূর্ব ও উত্তর উপকূলে গিয়ে আটলান্টিকে পড়েছে।

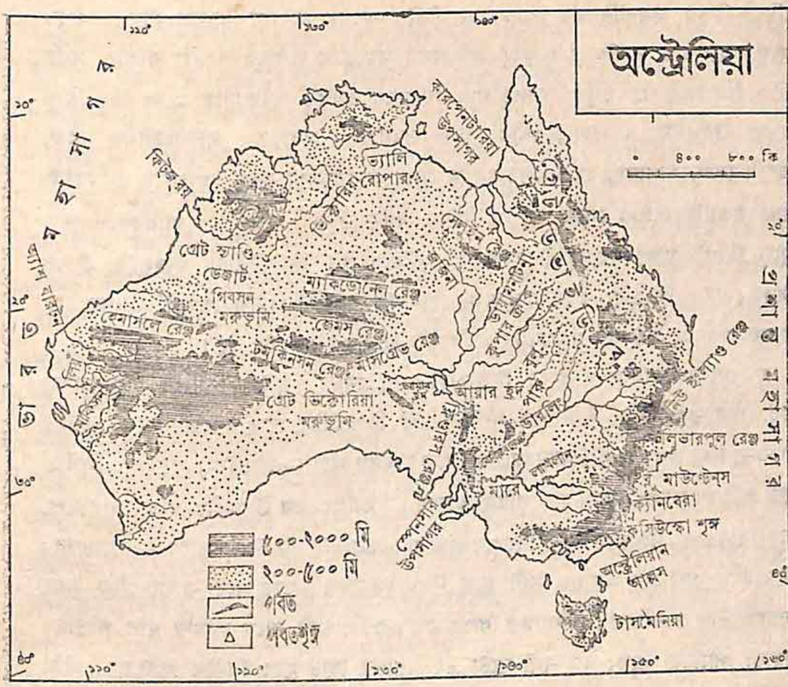
অধিবাসী : আয়তনের মতই জনসংখ্যার দিক থেকেও ব্রাজিল দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ। বর্তমানে এই দেশের লোকসংখ্যা প্রায় ৯৪,৫১০,০০০, অর্থাৎ মহাদেশের অর্ধেকের বেশি লোক ব্রাজিলের অধিবাসী। কিন্তু আয়তনের তুলনায় অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ভূমিতে মাত্র ১১ জন লোক বাস করে। প্রকৃত অর্থে দেশের অধিকাংশ এখনও সম্পূর্ণ জনশূন্য। তার মধ্যে আমাজনের গহন অরণ্যাঞ্চল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমগ্র আমাজন অববাহিকার মোট জনসংখ্যা ২০ লক্ষের বেশি নয় এবং তার অর্ধেকের বেশি নদীমুখের আশেপাশে কেন্দ্রীভূত। ব্রাজিলিয়ান হাইল্যাণ্ডও অপেক্ষাকৃত জনবিরল। এখানে পশুচারণ ও খনিকার্যকে অবলম্বন করে অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে জনবসতি গড়ে উঠেছে। তুলনামূলকভাবে উত্তর ও পূর্ব উপকূল এবং সন্নিহিত অঞ্চল সর্বাপেক্ষা জনবহুল। দেশের অধিকাংশ শহর ও নগর এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। অধিবাসীদের প্রায় ৬১ শতাংশ ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত।

রাজধানী : ব্রাজিলিয়া (২৭৭,০০৫ : ১৯৭০) : ১৯৬০ সালের এপ্রিলে গয়ান প্রদেশে অবস্থিত ব্রাজিলিয়া রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এর আগে ব্রাজিলের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগর রিও ডি জেনিরো রাজধানী ছিল। রাজধানী স্থানান্তরিত হবার একমাত্র কারণ ব্রাজিলিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান। প্রধানত পশুচারণ এই অঞ্চলের প্রধান জীবিকা হলেও অঞ্চলটি অনতিকালের মধ্যে দেশের প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে বলে ব্রাজিলিয়ানদের গভীর বিশ্বাস। নতুন রাজধানী পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্ট একটি অসাধারণ সুন্দর নগর। প্রশাসনিক গুরুত্ব ধীরে ধীরে শিল্প-বাণিজ্যকে আকর্ষণ করতে শুরু করেছে।

অস্ট্রেলিয়া

অবস্থান ও আয়তন : আয়তন ও লোকসংখ্যায় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ গোলার্ধে ১০°৪১´ ও ৪৩°৩৯´ (টাসমেনিয়াসহ) দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ১১৩°০৯´ ও ১৫৩°৩৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। উত্তরে অবস্থিত এশীয় রাজ্য ইন্দোনেশিয়া অস্ট্রেলিয়ার নিকটতম প্রতিবেশী। পূর্ব ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় ৩৮৬৪ কি দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩২২০ কি প্রশস্ত এই দেশের মোট আয়তন ৭,৬৮৬,৯০০ ব কি (মানচিত্র ১৬)।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী : অসম ভূপ্রকৃতি অনুসারে অস্ট্রেলিয়াকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন, পূর্বের উচ্চভূমি বা ঈস্টার্ন হাইল্যাণ্ডস, মধ্যবর্তী নিম্নভূমি অঞ্চল বা ইনটেরিয়র লোল্যাণ্ড বেসিন এবং পশ্চিমের মালভূমি বা ওয়েস্টার্ন প্ল্যাটু। পূর্ব উপকূল বরাবর উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত ভূভাগ প্রধানত অবক্ষয়িত মালভূমি,



মানচিত্র ১৬

পাহাড় ও নিচু পর্বতমালার সমন্বয়ে গঠিত। গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ নামে পরিচিত এই উচ্চভূমি স্থানে স্থানে উপকূলের দিকে খাড়া প্রাচীরের ন্যায় নেমে গেছে। গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের উত্তরাংশের গড় উচ্চতা ৬১০ মি। দক্ষিণ দিকে উচ্চতা আরও বেড়ে গেছে। এখানে গড় উচ্চতা বেশি হলেও (৯১৫ মি) দীর্ঘ অবক্ষয়ের ফলে স্থানে স্থানে বিভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট ছোটবড় অসংখ্য মালভূমি ও পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে নিউ ইংল্যাণ্ড রেঞ্জ ও লিভারপুল রেঞ্জ উল্লেখযোগ্য। আরও দক্ষিণে ব্লু মাউন্টেন এবং অস্ট্রেলিয়ান আল্পস পর্বতদ্বয় সর্বাপেক্ষা উঁচু। শেষোক্ত পর্বতের মাউন্ট কসিউস্কো শৃঙ্গের উচ্চতা ২২৩৪ মি। উচ্চভূমির পূর্বদিকে সংকীর্ণ উপকূলীয় সমভূমি বর্তমান। পূর্বের উচ্চভূমি ও পশ্চিমের মালভূমির মধ্যে অবস্থিত নিম্নভূমি উত্তরে কারপেনটারিয়া উপসাগরীয় উপকূল থেকে দক্ষিণে স্পেনসার উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানের উচ্চতা ১৫০ মিটারের নিচে। দক্ষিণে আয়ার হ্রদের নিকটে ভূমি সমুদ্রাঙ্ক থেকে প্রায় ১২ মি নিচু। স্পেন্সার উপসাগরের পূর্বদিকে ফ্লিণ্ডারস রেঞ্জ ও বেরিয়ার রেঞ্জ এবং নিম্নভূমি অঞ্চলের উত্তরাংশে সেলুইন রেঞ্জ ভূভাগের সমতা ব্যাহত করেছে। এই অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ

সঞ্চিত বিপুল জলরাশি প্রায় ৫০০০ আর্তেজীয় কূপের মাধ্যমে পাওয়া যায়। মহাদেশের ২৮ লক্ষ ব কি স্থান জুড়ে পশ্চিমের মালভূমি উপকূল অঞ্চল ব্যতীত সর্বত্র ৪৫০ মিটারের মত উচুঁ। মালভূমির মধ্যভাগে প্রাচীন পর্বতমালা প্রচণ্ড ক্ষয় হয়ে আরও উচ্চভূমি ও পাহাড়শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। মধ্যভাগে ম্যাকডোনেল রেঞ্জ, জেমস রেঞ্জ, মাসগ্রোভ রেঞ্জ, পিটারম্যান রেঞ্জ, টমকিনসন রেঞ্জ, পশ্চিমে হেমার্সলি রেঞ্জ ইত্যাদি ১০০০ থেকে ১৫০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু। মালভূমির অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিরাট মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণে গ্রেট ভিক্টোরিয়া মরুভূমি, উত্তরে গিবসন মরুভূমি এবং বৃহৎ বালুকাময় মরুভূমি বা গ্রেট স্যাণ্ডি ডেজার্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব মরুভূমির বালিয়াড়ি প্রায় ১৫-১৮ মি উঁচু।

মহাদেশের অধিকাংশ স্থানে নিত্যবাহী নদী নেই। দক্ষিণ-পূর্বাংশে মরে-ডালিং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ নদী। গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ থেকে উৎপন্ন ডালিং (৩০৭৫ কি) এবং অস্ট্রেলিয়ান আল্পস থেকে উৎপন্ন মরে (২৫৭৬ কি) পরস্পর মিলিত হয়ে দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে পতিত হয়েছে। ডালিং-এর উপনদীর মধ্যে ওয়ারেগো, বারওয়ান এবং মরের উপনদী হিসেবে লাখলান-মারামবিদগি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নভূমি অঞ্চলের অন্যান্য নদী হ্রদে গিয়ে পড়েছে। তার মধ্যে কুপার ক্রীক এবং ডায়ামনটিনা ও জর্জিনার সম্মিলিত ধারা ওয়ারবার্টন নদী নামে আয়ার হ্রদে পড়েছে। এছাড়া পারোয়া এবং বুলু নদী দুটো এই ধরণের ছোট হ্রদে বিলীন হয়েছে। দীর্ঘ উপকূলভাগে অসংখ্য ছোট-বড় নদী আছে। উত্তরে ফ্লিণ্ডার্স, রোপার, ড্যালি, ভিকটোরিয়া এবং পশ্চিমে ফিটজরয় অ্যাশবারটন, লিয়ঁ, মাকিসন ইত্যাদি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

অধিবাসী: অস্ট্রেলিয়ার মোট অধিবাসীর সংখ্যা ১২,৯৫৯,০০০। পৃথিবীর বৃহত্তম নগর টোকিওর জনসংখ্যা এর প্রায় কাছাকাছি। মোট অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ৬০,০০০ আদিবাসী, বাকি অধিবাসীরা ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত এবং তার ৯৯ শতাংশ ইংরেজ। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইংরেজদের আগমন ঘটে। তখন আদিবাসীদের সংখ্যা ছিল প্রায় দুলক্ষ এবং সমগ্র মহাদেশে একমাত্র অধিবাসী ছিল তারাই। ঐ সময় থেকে ধীরে ধীরে ইংরেজদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের সংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকে। বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম উপকূল ব্যতীত অন্য কোথাও আদিবাসীদের দেখা যায় না।

প্রতি বর্গ কিলোমিটার ভূমিতে গড় ২ জন অপেক্ষা কম লোকের বাস অস্ট্রেলিয়াকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনবিরল মহাদেশে পরিণত করেছে। এছাড়া অত্যন্ত অসম জনঘনত্ব এই মহাদেশের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমগ্র ভূভাগের এক-তৃতীয়াংশ জনমানবশূন্য; অন্য এক-তৃতীয়াংশের প্রতি ১৩ বর্গ কিলোমিটার ভূমিতে গড় একজন লোক বাস করে। প্রকৃতপক্ষে মোট অধিবাসীর ৯৩ শতাংশ পূর্ব-উপ-

কূলের ৮০৫ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে কেন্দ্রীভূত এবং তার প্রায় ৬০ শতাংশ উপ-কূলবর্তী শহর ও নগরসমূহের বাসিন্দা। ছয়টি রাজ্যের রাজধানীর অধিবাসী অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ।

রাজধানী : ক্যানবেরা (জনসংখ্যা ১৫৯,৮৩৫ : ১৯৭১) : দক্ষিণ-পূর্বের নিউ সাউথ ওয়েলস প্রদেশে উপকূল থেকে ১১৩ কি অভ্যন্তরে এবং সমুদ্রাঙ্ক অপেক্ষা ৫০০ মি উর্ধ্বে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী। ক্যানবেরা নগর হিসেবে অপেক্ষাকৃত নতুন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী স্থাপনের জন্য স্থানটি প্রথম নির্বাচিত হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান স্থপতি গ্রিফিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী নগরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হবার চার বছর পরে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে মেলবোর্ন থেকে রাজধানী স্থায়ীভাবে ক্যানবেরাতে স্থানান্তরিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা ক্যানবেরাকে উদ্যান নগর বলে থাকে। প্রশাসনিক কেন্দ্র ব্যতীত নগরটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। দেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখানে অবস্থিত। এখানকার চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নকেন্দ্র পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত। এছাড়া এখানকার জাতীয় গ্রন্থাগার, যাদুঘর এবং মাউন্ট স্ট্রমলোতে নির্মিত মানমন্দিরের দক্ষিণ গোলার্ধের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নয়টি দূরবীন পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক জগতের নিকট একটি প্রধান আকর্ষণ।

চতুর্থ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের ভূমিকা

স্বাধীনতা লাভের আগে ভারতের বাণিজ্য যে কোন কৃষিভিত্তিক ঔপনিবেশিক দেশের মতই ছিল। অধিকাংশ বাণিজ্য যুক্তরাজ্য ও তারই অনুগত রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। ঐ সময়ে ভারত থেকে প্রধানত সুতীবস্ত্র, পাট ও পাটজাত সামগ্রী, চা, মশলা, চামড়া এবং খনিজ পদার্থ হিসেবে অভ্র ও ম্যাঙ্গানীজর ইত্যাদি রপ্তানী করা হত। আমদানীকৃত দ্রব্যের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাধান্য ছিল। ভারত স্বাধীন হবার পর দ্রুত শিল্পায়নের ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নানারকম পরিবর্তন দেখা দেয়। পুর্বের ন্যায় মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশের পরিবর্তে ভারতের বাণিজ্য সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং রপ্তানীকৃত দ্রব্যের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে পাঁচ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। আমদানীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটেছে। আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমদানীকৃত সামগ্রীর প্রকারও পরিবর্তিত হয়েছে।

ইউরোপ অথবা উত্তর আমেরিকার দেশগুলির তুলনায় ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ কম হলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান বর্তমানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বাণিজ্যিক দেশসমূহের মধ্যে ভারত সপ্তদশ স্থানের অধিকারী। বাণিজ্যের দিক থেকে এশিয়ায় ভারতের স্থান দ্বিতীয় এবং আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির চাইতে ভারত অনেক এগিয়ে আছে। ১৯৭১-৭২ সালে ভারতের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল পৃথিবীর প্রায় ২ শতাংশ, যার আর্থিক মূল্য ৩৪১৮-৬৩ কোটি টাকা।

নানারকম শিল্প প্রতিষ্ঠা ও কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি উপলক্ষে বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল ইত্যাদির প্রয়োজন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে রপ্তানী অপেক্ষা আমদানীর পরিমাণ অনেক বেশি। এর ফলে বাণিজ্যিক অসাম্যের সৃষ্টি হয়েছে। বাণিজ্যের মারফৎ যে টাকা আয় হয় তার চাইতে বিদেশ থেকে জিনিস কিনে খরচের পরিমাণ বেড়ে গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৭১-৭২ সালে ভারতের আমদানীর আর্থিক মূল্য ছিল ১৮২২·০২ কোটি টাকা। কিন্তু ওই একই বছরে রপ্তানীকৃত সামগ্রীর মূল্য ছিল ১৬০৬·৬১ কোটি টাকা। অবশ্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ক্রমে কমিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। (তালিকা ১)।

তালিকা ১

সাল	আমদানী (কোটি টাকায়)	রপ্তানী (কোটি টাকায়)	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ (কোটি টাকায়)	বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত
১৯৫০-৫১	৬৫০·২১	৬০০·৬৪	১,২৫০·৮৫	–৪৯·৫৭
১৯৫৫-৫৬	৬৭৮·৮৪	৫৯৬·৩২	১,২৭৫·১৬	–৮২·৫২
১৯৬০-৬১	১,১৩৯·৬৯	৬৬০·২২	১,৭৯৯·৯১	–৪৭৯·৪৭
১৯৬৫-৬৬	১,৪০৮·৫৩	৮০৫·৬৪	২,২১৪·১৭	–৬০২·৮৯
১৯৬৬-৬৭	২,০৭৮·৩৬	১,১৫৬·৫৬	৩,২৩৪·৯২	–৯২১·৮০
১৯৬৭-৬৮	২,০০৭·৬১	১,১৯৮·৬৯	৩,২০৬·৩০	–৮০৮·৯২
১৯৬৮-৬৯	১,৯০৮·৬৩	১,৩৫৭·৮৭	৩,২৬৬·৫০	–৫৫০·৭৬
১৯৬৯-৭০	১,৫৮২·৬৭	১,৪১৩·২৮	২,৯৯৫·৯৫	–১৬৯·৩৯
১৯৭০-৭১	১,৬৩৪·২০	১,৫৩৫·১৬	৩,১৬৯·৩৬	–৯৯·০৪
১৯৭১-৭২	১,৮১২·০২	১,৬০৬·৬১	৩,৪১৮·৬৩	–২০৫·৪১

ভারতের আমদানীকৃত সামগ্রীর মধ্যে দুই শ্রেণীর সামগ্রী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। যেমন, ভারী এবং হালকা যন্ত্রপাতি, নানারকম যান ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ এবং বিভিন্ন ধরনের শিল্পজাত সামগ্রী। এই দুই ধরণের জিনিস মোট আমদানীর প্রায় ৫৫ শতাংশ। যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মধ্যে অবৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির পরিমাণ অনেক বেশি। শিল্পজাত সামগ্রীর মধ্যে নানারকম মূলধাতু, ধাতুনির্মিত দ্রব্যাদি, বয়ন-শিল্পের প্রয়োজনীয় সুতো, এবং কাগজ ইত্যাদির স্থান প্রথম। আমদানীর তালিকায় খাদ্যের স্থান তৃতীয় এবং মোট আমদানীকৃত সামগ্রীর ২০ শতাংশ খাদ্যবস্তু। নানারকম দানাশস্য, বিশেষ করে গম ও দানাশস্য থেকে তৈরি ভোজ্য পদার্থ খাদ্যবস্তুর মধ্যে প্রধান। তার পরেই ফল, নানারকম সবজি ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের স্থান। অন্যান্য আমদানীকৃত সামগ্রীর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর কাঁচামাল (অভোজ্য), রাসায়নিক দ্রব্য, খনিজ তৈল, যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত ঘর্ষণ-হ্রাসকর তৈল বা লুব্রিকেন্ট, প্রাণিজ ও উদ্ভিদ তৈল, কফি, কোকো, তামাক ইত্যাদি।

আমদানীর ন্যায় রপ্তানীর তালিকাতেও শিল্পজাত সামগ্রী এবং খাদ্যবস্তুর স্থান প্রথম। মোট রপ্তানীকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে প্রায় ৪২ শতাংশ শিল্পজাত সামগ্রী ও ৩২ শতাংশ খাদ্যবস্তু। শিল্পজাত সামগ্রীর মধ্যে বয়নশিল্পে ব্যবহৃত সুতো এবং বস্ত্র সর্বোচ্চ স্থান নিয়েছে। তার পরেই চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের স্থান। খাদ্যবস্তুর তালিকায় চা, কফি এবং নানারকম মশলা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া পশুখাদ্য,

ফল, সবজি এবং চিনিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রপ্তানীর ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থান নিয়েছে কাঁচামাল (অভোজ্য), যেমন অপরিশোধিত ধাতু, ব্যবহৃত ধাতু, পাট, তুলো, রেশম ইত্যাদি।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ১৯০টি দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ভারত মহাসাগরের প্রান্তে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণে সাহায্য করেছে। প্রায় ১২০টি দেশ থেকে ভারতে জিনিস আমদানী হয়, কিন্তু মোট সামগ্রীর অধিকাংশ (প্রায় ৯০ শতাংশ) মাত্র ৫০টি দেশ থেকে আসে। আমদানীর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সর্বোচ্চ। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে বিরাট পরিমাণ খাদ্য এবং অন্যান্য সামগ্রী আমদানী হয়ে থাকে। ভারতে রপ্তানীকারক প্রথম দশটি দেশ হল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, পশ্চিম জার্মানি, সোভিয়েত রাশিয়া, ইরান, জাপান, মিশর, অস্ট্রেলিয়া এবং ইটালী। এই দশটি দেশ সম্মিলিতভাবে মোট আমদানীকৃত সামগ্রীর প্রায় ৭২ শতাংশ সরবরাহ করে থাকে। রপ্তানীর ক্ষেত্রেও ভারতের বাজার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থানের অধিকারী। যুক্ত-রাষ্ট্রের পরেই যুক্তরাজ্যের স্থান। ভারতের মোট রপ্তানীর প্রায় ৬৬ শতাংশ দশটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান, মিশর, সুদান, পশ্চিম জার্মানি, শ্রীলঙ্কা, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ক্যানাডা। ভারত থেকে পৃথিবীর ১৮৩টি দেশে নানারকম সামগ্রী রপ্তানী হয়ে থাকে।

ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক

ভারতের প্রতিবেশী রাজ্য বলতে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, সিকিম, ভুটান, বাংলাদেশ এবং ব্রহ্মদেশকে বোঝায়। আয়তন, লোকসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিচারে এসব দেশ ভারত থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। প্রত্যেকটি দেশের মত ভারতের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও, কৃষিসম্ভারের ব্যাপকতা এবং স্বাধীনোত্তর যুগে শিল্পপ্রসার প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধির আসন দিয়েছে। অধিকাংশ প্রতিবেশী রাজ্যে শিল্প এখন পর্যন্ত ভালভাবে গড়ে ওঠেনি। মূল খনিজ সম্পদ এবং কাঁচামালের অভাব শিল্প প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে তুলনায় ভারতের শিল্প কেবল সুপ্রতিষ্ঠিত, তাই নয়, নানা শিল্পের সমাবেশ যে কোন প্রতিবেশী রাজ্যের তুলনায় বিস্ময়কর।

নৈকট্য এবং পরিবহণের সুবিধা ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশসমূহের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে অত্যন্ত সহায়ক। ভারতের সঙ্গে এই সব দেশের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ বেশি না হলেও, অর্থনৈতিক বিচারে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী মারফৎ ভারত ঐসব দেশের চাহিদা পূরণ করে থাকে। এবং বিনিময়ে নানাধরনের কাঁচামাল ও খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করে। প্রত্যেকটি রাজ্যের

ক্ষেত্রে ভারত থেকে রপ্তানীর পরিমাণ ভারতে আমদানীর পরিমাণের চাইতে অনেক বেশি। স্থলপথ ও জলপথে এই বাণিজ্য হয়ে থাকে। আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান ও সিকিমের সঙ্গে আদান-প্রদান সম্পূর্ণভাবে স্থলপথে পরিচালিত হয়। শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে কিন্তু তা জলপথে চলে। পক্ষান্তরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে উভয়পথেই জিনিসপত্র আসা-যাওয়া করে।

উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রতিবেশী রাজ্য থেকে আমদানীকৃত সামগ্রীর নানা-রকম বৈচিত্র্য দেখা যায়। অন্যদিকে ভারত থেকে ঐ সমস্ত রাজ্যে রপ্তানীকৃত সামগ্রীর ধরন প্রায় একই রকম।

(১) ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য

আফগানিস্তান প্রধানত ফলের দেশ। এখানে আপেল, আঙুর, নাসপাতি, কিসমিস, খুবানি, বেদানা ইত্যাদি নানারকম ফল জন্মায়। এছাড়া এখানে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশম এবং পশম থেকে দামী কার্পেট তৈরি হয়। ভারত আফগানিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার। প্রধানত শুকনো ফল, আপেল, আঙুর, পশম এবং কার্পেট ভারতে আমদানী হয়। ভারত থেকে রপ্তানীকৃত সামগ্রীর মধ্যে কালো ও সবুজ চা প্রধান। তাছাড়া কার্পাস ও কৃত্রিম তন্তুজাত বস্ত্র, চিনি, নানারকম যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎচালিত পাখা, সাইকেল, কাগজ, প্লাস্টিকের জিনিস, ঔষধ ইত্যাদি অন্যান্য প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। ১৯৭১-৭২ সালে আফগানিস্তান থেকে ভারতে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার জিনিস আমদানী হয় এবং বিনিময়ে ৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার জিনিস রপ্তানী হয়।

(খ) ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য

পাকিস্তানের উৎপাদন হিসেবে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলো বা কার্পাস, পশম এবং চামড়া সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের রপ্তানীকৃত সামগ্রীর মধ্যে তুলোর স্থান প্রথম। কিছুকাল আগেও ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের নিবিড় বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ১৯৫২ সালে উভয় দেশের মধ্যে প্রায় ৭৭ কোটি টাকা মূল্যের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান হয়। পাকিস্তান থেকে প্রধানত তুলো, পশম, পাট, খাদ্যসামগ্রী, তৈলবীজ এবং মাছ আমদানী করা হত। বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর পাট ও মাছের উৎপাদন পাকিস্তানের হাতছাড়া হয়ে গেছে। বর্তমানে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বাণিজ্যিক সম্পর্কও যথেষ্ট শিথিল হয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৬৪-৬৫ সালে পাকিস্তান থেকে ভারতে ১৫ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার জিনিস আমদানী করা হয়। কিন্তু সেটা ক্রমাগত কমে ১৯৬৯-৭০ ও ১৯৭০-৭১ সালে প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার জিনিস রপ্তানী করে। রপ্তানীকৃত সামগ্রীর মধ্যে প্রধানত কয়লা, লৌহনির্মিত

ধাতু, যন্ত্রপাতি, রঙ, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কার্পাসবস্ত্র, এবং চিনি ইত্যাদি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল। কিন্তু আমদানীর মত রপ্তানীও প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। ১৯৬৮-৬৯ এবং ১৯৬৯-৭০ সালে বছরে রপ্তানীর পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার নিচে ছিল। ১৯৭০-৭১ সালে রপ্তানীর পরিমাণ বেড়ে ৩৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

(গ) ভারত ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্য

তুলনামূলক বিচারে ভারত ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ অনেক বেশি। ১৯৭১-৭২ সালে ভারত ২৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার জিনিস নেপালে রপ্তানী করে এবং ১০ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার জিনিস নেপাল থেকে আমদানী করে। রপ্তানী-কৃত অজস্র ধরনের সামগ্রীর মধ্যে লবণ, ব্যবহৃত লৌহ, কয়লা, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কার্পাস বস্ত্র ও রেশববস্ত্র, কেরোসিন, চা, চটের থলি, কাগজ, ঔষধ, নানা-রকম রাসায়নিক দ্রব্য, সাবান, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারত নেপাল থেকে প্রধানত খাদ্য-সামগ্রী আমদানী করে থাকে।। যেমন, ঘি, চাল, সর্সে ও তিল ইত্যাদি তৈলবীজ, কয়েকরকম মশলার মধ্যে বিশেষ করে গোলমরিচ, তামাক ও ইক্ষু। এছাড়া নানারকম ভেষজ গুল্ম, কাঠ, রঙ তৈরিতে ব্যবহৃত বৃক্ষের ছাল ইত্যাদি আমদানী করা হয়ে থাকে। আমদানীকৃত সামগ্রীর মধ্যে ঘি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। ১৯৬৭ সালে প্রায় ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার ঘি ভারতে আসে।

নেপালের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এক-মাত্র চীন ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে নেপালের বাণিজ্যিক লেন-দেন ভারতীয় বন্দর ও স্থলপথের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

(ঘ) ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে বাণিজ্য

আমদানী ও রপ্তানীর তালিকায় শ্রীলঙ্কার স্থান যথেষ্ট উঁচুতে। ১৯৭১-৭২ সালে ভারত শ্রীলঙ্কা থেকে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার জিনিস আমদানী করে কিন্তু বিনিময়ে ২১ কোটি ২১ লক্ষ টাকার জিনিস রপ্তানী করে। শ্রীলঙ্কার প্রধান উৎপাদন চা, রবার এবং নারকোল। ভারত রবার এবং নারকোলের অন্যতম প্রধান ক্রেতা। শ্রী-লঙ্কায় উৎপন্ন নারকোলের শুকনো শাঁসের প্রায় সবটুকু ভারতে আসে। এছাড়া নারকোল তেল, দারচিনি ও লবঙ্গ ইত্যাদি মশলা, শুকনো মাছ, গ্রাফাইট এবং দামী পাথর আমদানী করা হয়। বিনিময়ে ভারত থেকে কয়লা, কার্পাস ও কার্পাসবস্ত্র, কৃত্রিম তন্তুজাত বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গঠনে সহায়তা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, ডিজেল ইঞ্জিন, যন্ত্রাংশ, রেলের সরঞ্জাম, মোটর ও ট্রাকের

চাকা, তামাক, খনিজ তৈল ও তৈলজাত সামগ্রী, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সিমেন্ট ইত্যাদি প্রধান রপ্তানীকৃত দ্রব্য।

(ঙ) ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে বাণিজ্য

ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহুদিনের যদিও মোট বাণিজ্যের পরিমাণ নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার তুলনায় অনেক কম। ১৯৭১-৭২ সালে ভারত মোট ১০ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার জিনিস ব্রহ্মদেশে রপ্তানী করে এবং পরিবর্তে ৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার জিনিস আমদানী করে। চাল এবং সেগুন কাঠ দীর্ঘদিন ধরে ব্রহ্মদেশে প্রধান বাণিজ্যিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হত। বর্তমানে এদের আমদানী কমে গেছে। সাম্প্রতিক এক চুক্তি অনুযায়ী ভারত ব্রহ্মদেশ থেকে ইউরিয়া নামক রাসায়নিক সার ও নানারকম খনিজ আকরিক, যথা, দস্তা, সীসা, টিন, টাংস্টেন, নিকেল ইত্যাদি আমদানী করবে। এ সবের পরিবর্তে ভারত থেকে রপ্তানী হবে কার্পাস বস্ত্র, ঔষধ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং লৌহ ও ইস্পাতজাত সামগ্রী।

(চ) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য

গত কয়েক বছরের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নিবিড় বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মধ্যে চা, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, কার্পাস-বস্ত্র, চামড়া এবং মাছের স্থান প্রথম। ভারত বিশেষ করে পাট, মাছ, দামী শাড়ি ইত্যাদি আমদানী করে থাকে। শিল্পে অনগ্রসর বাংলাদেশে ভারত বিভিন্ন রকমের জিনিস রপ্তানী করে। ভারতীয় রপ্তানীর মধ্যে কেরোসিন, কয়লা, ট্রাক ও মোটর গাড়ির যন্ত্রাংশ, কার্পাস ও কৃত্রিম তন্তুজাত বস্ত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, লৌহ ও ইস্পাত-জাত সামগ্রী, চিনি, ঔষধ ইত্যাদি প্রধান। সম্প্রতি এক চুক্তি অনুযায়ী ভারত ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের রেলের বোগি ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ সরবরাহ করবে।

(ছ) ভারতের সঙ্গে ভুটান ও সিকিমের বাণিজ্যিক সম্পর্ক

বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের দিক থেকে ভারতের সঙ্গে পার্বত্যরাজ্য ভুটান ও সিকিমের সম্পর্ক দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫৯ সালের পূর্বে তিব্বতের সঙ্গে এই রাজ্যদুটির বাণিজ্যিক লেনদেন চলত। কিন্তু চীন কর্তৃক তিব্বত অধিকৃত হবার পর ঐ বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে উভয় রাজ্যের অজস্র প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রায় অধিকাংশ ভারত সরবরাহ করে থাকে। এই সব বিভিন্ন রকম সামগ্রীর মধ্যে কার্পাস ও কৃত্রিম তন্তুজাত বস্ত্র, কেরোসিন, পেট্রল, নানাধরনের খাদ্যবস্তু, চিনি, লবণ, মনোহারী ও

প্রসাধন দ্রব্য, ঔষধ, মোটর ও ট্রাকের যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, কাগজ ও পিজবোর্ড, সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদি প্রধান। বিনিময়ে ভারত ভুটান থেকে- রেশম বস্ত্র, ভেষজ রঙ, চাল, ফলের মধ্যে আপেল, কমলালেবু, ফলের রস, জ্যাম, জেলি এবং মদ আমদানী করে। সিকিম থেকে আমদানীকৃত সামগ্রী হিসেবে আপেল, কমলালেবু, ফলের রস ও নানারকম মদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভুটান ও সিকিম ভারতের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। দুই দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ভারতীয় বন্দর ও স্থলপথের সাহায্যে হয়ে থাকে।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস

Desh O Manush 5 **Rs 4**

প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা ৬